আকাশগুচ্ছ

গিয়াস আহমেদ

ছোটবেলায় আমরা কাঠি লজেন্স চুষতাম। চাছা বাশের ফালির মাথায় লাল রঙের মিঠাই, সিলগালা যে রকম লাগায় সে রকম লাগানো। আনন্দে চুষতাম আর জিভ বের করে দেখাতাম, দ্যাখ তো লাল হইছে নাকি!

সেই ছেলেবেলায় আমরা যখন কাঠি লজেন্স চুষছি, তখন আমাদের শহরে এলো খবরটা। কে আনলো, কিভাবে এলো জানি না। জানাজানিটা জরুরিও ছিল না। জরুরি যেটা সেটা হলো, শোনা গেল, প্লেনে উঠলে নাকি এক রকমের চকোলেট খেতে দেয়, সেই চকোলেট নাকি আবার সারা দিন যতো খাও শেষ হয় না, সারা রাত ধরে খাও শেষ হবে না। কি তাজ্জব কথা! আহা, যদি পেতাম ওই চকোলেট একবার মুখে!

তখন ওই ছেলেবেলায় আমরা মুখ হা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে ওই দূর আকাশে প্লেন যাওয়া দেখি। পথের পাচালির অপু আর দুর্গা সেই যে ট্রেন দেখতে ছুটেছিল, আমরা তো তাদের চেয়ে একটু ছোট তখন। ওই আকাশের টিনের খোলের মতো গো গো করে প্লেনের উড়ে যাওয়া, তার গায়ে রোদের ঝলকানি তারপর হঠাৎই মেঘের ভেতর হারিয়ে যাওয়া– আমরা বড় চোখ করে বিস্ময়ে দেখি।

তারপর যখন বড় হয়ে উঠি আমরা, জেনে যাই প্লেনে যে চকলেট দেয়, যে যাদুর চকলেট সারা দিন খেলেও শেষ হয় না, সারা রাত খেলেও শেষ হয় না, তার নাম চুইংগাম।

প্রথম প্লেন ভ্রমণ এবং ফার্মগেট ওভারবৃজ

১৯৯৮ সালের শেষের দিক। একটি দৈনিক পত্রিকা থেকে বেরিয়ে আমরা আরেকটি দৈনিক প্রকাশের তোড়জোড় করছি। পত্রিকার সম্পাদক যাবেন সিলেট। আমাকেও যেতে হবে সঙ্গে। সন্ধ্যায় তিনি বললেন, কাল সকাল এগারোটায় আমাদের ফ্লাইট। নয়টার মধ্যে অবশ্যই এয়ারপোর্টে আসবে।

তার মানে আমি প্লেনে যাচ্ছি! মানুষের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে, আনন্দে আমার মাথা আকাশ ফুড়ে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম বাসায়। খুশিতে কি সব বাকুম-বুকুম যে বললাম! নানান ছলে আমি যে কাল প্লেনে যাচ্ছি কলিগদেরও জানাতে ছাড়লাম না। সত্যি বলছি, কারো কারো চোখে সেদিন ঈর্ষাও দেখেছিলাম। কিন্তু ওসব ভাবার সময় তখন আমার থাকলে তো! বরং একাই শপিংয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কাল আমি প্লেনে যাবো, প্রস্তুতি আছে।

কেনাকাটা শেষে এসে দাড়িয়েছি ফার্মগেট ওভারবৃজের নিচে। আমি তেজগাও পলিটেকনিক স্কুলের ছাত্র। ওভারবৃজটা তো আমাদের চোখের সামনেই হলো। তো সেদিনও ওভারবৃজের ওপর দিয়ে নিচ দিয়ে কতো লোকজন যাচ্ছে-দেখছি। আসলে আমার মনে হচ্ছিল সবাই আমাকেই দেখছে-দেখো দেখো, এই লোকটা কাল প্লেনে যাবে!

কিছুতেই কিছু আমার যায় আসে না, এ রকম দার্শনিক চোখে তাদের দিকে তাকাতে হঠাৎ ঊর্ধ নয়নে দেখলাম ওভারবৃজটাকে। আমার মনে হলো, ওভারবৃজটা ভীষণ উচু, আকাশ ছোয়া। আর কাল সকালে আমি টিনের ক্যাপসুলের মতো একটা জিনিসে ঢুকে ওই আকাশে ভেসে

যাবো। তখনই আমার পা থেকে পেটের ভেতর যেন শিরশির করে বয়ে গেল হিম ভয়। তীব্র আতংকে কেপে উঠলো সারা গা, আমার সর্বস্ব।

পরদিন জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের রানওয়েতে জিএমজি-র প্লেনটাকে মনে হলো একটা ফড়িং। এতো ছোট্ট! বড় বড় প্লেনের পাশে একটা খেলনা! ঢুকে গেলাম ওর ভেতর। ভয়টয় কেন কে জানে একটুও করলো না তখন আর। বরং মজা লাগলো তখন, প্লেন ওড়ার পর পরই যখন ভীষণ সুন্দরী হস্টেস ট্রেতে করে চকলেট আর ম্যাংগো জুস এনে ধরলেন সামনে। আরে, এই চকলেট আর জুস আমরা পাড়ার দোকান থেকে এক থেকে দশ টাকা দিয়ে কিনে খাই!

হেসে বললাম, চুইংগাম নেই?

এয়ারহস্টেস সুন্দর ভ্রূযুগলে প্রশ্নচিহ্ন একে বললেন, কেন আপনার কান ব্যথা করছে? আসলে প্লেনে আমরা চুইংগাম দেই না। অনেকেই এখানে ওখানে লাগিয়ে সিট নষ্ট করে!

হাসলাম। জিএমজি ছোট প্লেন হওয়ায় দেখলাম একটা সুবিধাও আছে। বেশ নিচু দিয়ে ওড়ে। নিচের সব কিছু ছবির মতো দেখা যায়। ঘর-বাড়ি, রাস্তা-গাড়ি, ফিতের মতো নদীটার অনেক দূর, ক্ষেতে কৃষক, নদীতে নৌকা... দেখতে দেখতে পকেট থেকে চুইংগাম বের করে মুখে পুরলাম। নিয়েই এসেছিলাম সঙ্গে। মুখের ভেতর আমার ছেলেবেলা মিষ্টি সুগন্ধ ছড়ায়। যার রেশ শেষ হবে না জীবনে।

বাঙালির বালি যাত্রা এবং আকাশে আগুন!

সেটা জানুয়ারির শেষ, ২০০৩। চললাম ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে। উড়লাম সিংগাপুর এয়ারলাইনস-এর আমন্ত্রণে। সঙ্গী *আমার দেশ*-এর সাংবাদিক মাসুদ কামাল। তখন ছিলেন *জনকণ্ঠ* পত্রিকায়। এক বন্ধু মজা করে আমাদের এই টুরের নামকরণ করলো *বাঙালির বালি যাত্রা।*

যাওয়ার দিন আমাদের সিংগাপুরে ট্রানজিট, যথানিয়মে আসার দিনেও। আসার দিন আমরা যখন সিংগাপুর থেকে ঢাকার ফ্লাইটে উঠবো, সিংগাপুরে তখন তুমুল বৃষ্টি। সিংগাপুরের চাংগি এয়ারপোর্টের ওপেন এয়ার স্মোকিং জোন সানফ্লাওয়ার গার্ডেনে ওই মুষলধারার বৃষ্টি দেখতে দেখতে আমরা দুই বিজ্ঞ(!) মাথা নাড়লাম-নাহ, এই বাজে আবহাওয়ায় প্লেন ছাড়বে না।

সিংগাপুর এয়ারলাইনস যা করে তাই করলো, ওই আকাশভাঙা বৃষ্টিকে পাত্তা না দিয়েই কাটায় কাটায় ছাড়লো। প্রাণে তো পানি নাই! যেভাবে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, যদি একটা *ঠাটা* পড়ে আমাদের প্লেনের ওপরই! জানালায় মুখ চেপে বাইরে তাকিয়ে আছি। সব সময় তাই করি। ভালো লাগে। বোর্ডিং কার্ড নেয়ার সময়ই বলি, উইন্ডো সাইড প্লিজ।

আমি বাইরে তাকিয়ে আছি। প্লেন উঠে গেছে মেঘের ওপরে। বৃষ্টি আর দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টি তো পড়ে মেঘ থেকে, মেঘের নিচে বৃষ্টি। মেঘ দেখছি। কিন্তু মাথার ভেতর তো রয়ে গেছে ঝড়ো হাওয়া, ভাসিয়ে নেয়া বৃষ্টি ...। সিংগাপুর ছেড়ে আধ ঘণ্টাখানেক এসেছি। হঠাৎ দেখি, সামনের মেঘে আগুন ধরে গেছে! লাল আগুন, সিদুরে আগুনে ভরা মেঘ উথাল-পাথাল ঢেউ খেলছে। আমাদের প্লেনটা যাচ্ছে ওই আগুনের মধ্যেই ঢুকে! খামচে ধরলাম মাসুদভাইয়ের হাত। তার সম্ভবত ঘুমে চোখ লেগে এসেছিল সবে।

চমকে উঠে বললেন, কি হয়েছে?

কি হয়েছে না কি হতে যাচ্ছে তাকে বুঝিয়ে বলাও কঠিন তখন আমার পক্ষে। দেখলাম, মাসুদভাই হাসছেন! আমার ভয় খাওয়া চোখের সামনে তিনি বিশাল হাসি দিয়ে বললেন, কোথাও সূর্য ডুবছে না হয় উঠছে, ওটা আভা।

এয়ারহস্টেসকে ডেকে জেনে নিলাম, আমরা শ্রী লংকা পার হচ্ছি। এখানে এখন সন্ধ্যা হচ্ছে। মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্ধ্যা ও প্রভাত কথা ...।

বিশ্বের দীর্ঘতম উড়ালের প্রথম যাত্রী

মজার দিবস ও রজনী। ২০০৪ সালের কোরবানির ঈদ। তখন ডিভি লটারি চলছে। রাস্তার মাথায় মাথায় ব্যানার ভাসে বাতাসে– *চলো যাই স্বপ্নের আমেরিকা!* পরিবারের সবার সঙ্গে দিনভর ঈদের আনন্দ কাটিয়ে রাত পৌনে বারোটার ফ্লাইটে চললাম সেই আমেরিকায়। ওই ঈদের রাতেও সিংগাপুর এয়ারলাইনস বাংলাদেশের সেলস ম্যানেজার ইয়ামীন কবির এলেন এয়ারপোর্টে বিদায় জানাতে। তার প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে একবার বেড়িয়ে এসেছি বালি। সেই থেকে আমাদের যোগাযোগ আর বন্ধুত্ব গলাগলি করে বেড়েছে এবং আমার ধারণা, ইয়ামীন আমার ধরন–ধারণ খানিকটা বুঝেও ফেলেছেন। তিনি আমেরিকার প্রোগ্রাম শেডিউলটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে যে কথাটি বার বার বললেন তা হলো–বস, ওখানে দুটো ফরমাল ডিনার আছে। ড্রেস কোড আছে। ও দুটোতে অন্তত সুট পরে যাবেন, প্লিজ।

তার কাতর স্বর শুনে মনে হলো, তিনি ধরেই নিয়েছেন আমি গেঞ্জি–ফেঞ্জি পরে ওখানে হাজির হবো।

জেদ করে স্থির করলাম, আমেরিকায় যাবো নতুন সুট পরে। আর ভদ্রলোক চেনা যায় নাকি জুতা দেখে! সুতরাং নতুন জুতাও কেনা দরকার।

আমার সংকল্প শুনে বন্ধুরা বললো, ঈদের আর দুদিন বাকি, এখন তোকে সুট বানিয়ে দেবে কোন দর্জি? তার চেয়ে আমার সুটটা নিয়ে যা।

একদিনে পেলাম চার বন্ধুর সুট নেয়ার আমন্ত্রণ। আমি তবু সংকল্পে অটুট, আনকোরা সুটই আমার চাই। বানানো যাবে না তো কি হয়েছে, কিনে ফেলবো।

এরই মধ্যে আমার বন্ধু আবু জাফর স্বপন সিরিয়াসলি বললো, তুই নতুন জুতা কিনবি? আমার জুতার কারখানার সঙ্গে খাতির আছে। চল আমার সঙ্গে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এক জোড়া জুতা কিনতে কারখানায় যাবো! কোথায় সেটা?

স্বপন গম্ভীর মুখে বললো, ঠাটারী বাজার। অক্ষয় শু কম্পানি।

জুতার দোকানের গাড়ি এলিফ্যান্ট রোডের কোণা শাহবাগ থেকে আমাদের পাচজনের বহর চললো ঠাটারী বাজারের অক্ষয় শু কম্পানিতে। এর মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির আর্ট ইন্সটিটিউট থেকে পাস করা দুজন শিল্পীও আছেন। একজন আবার গোল্ড মেডালিস্ট। তারা জুতার ডিজাইন পছন্দ করবেন!

এরপর সুটের পালা। এবারও এগিয়ে এলো সহৃদয় স্বপন আর বন্ধু ফারুখ আহমেদ। কোরবানির দুদিন আগের রাত এগারোটায় আমরা এলিফ্যান্ট রোডে ঘুরছি। রেডিমেড সুট আর পাওয়া যায় না! সুন্দর জ্যাকেট ও ব্লেজারে দোকান ভর্তি। কিন্তু প্যান্টটা নাই! রাত বাড়ছে। একটি একটি করে দোকান বন্ধ হচ্ছে। ফারুখ শেষবারের মতো যখন বোঝানোর চেষ্টা করছে, তার

সুটটা নতুনই আছে, ড্রাইওয়াশও করা আছে, সেটা যেন আমি নিয়ে নেই। তখন ক্লিওপেট্রা নামের একটি দোকানে পাওয়া গেল সুট। আহ!

ঈদের রাতে আমি ইয়ামীনকে *টা টা* করে ঢুকে পড়লাম সিংগাপুরগামী ফ্লাইটে। আমার পাশের সিট দেখি খালি। খালি সিটে আলতো করে শুইয়ে রাখলাম আমার বড় সাধের কোট। হস্টেস এসে বললেন, আপনার কোটটা তুলে রাখি? কোট রাখার জন্য আমাদের জায়গা আছে।

আমি রাজি হলাম না। কোটের পকেটে আমার পাসপোর্ট, টিকেট, নানান জিনিসপত্র। নকলবাজ ছাত্ররা যেমন একেক পকেটে একেক প্রশ্নের উত্তর লিখে নিয়ে যায়, আমার কোটের পকেটে তেমন নানান কাগজ। বিপত্তিটা ঘটলো একটু পরে। ওয়েলকাম ড্রিংকস দেয়ার সময় হস্টেস পুরো গ্লাস পানীয় ঢেলে ফেললেন আমার কোটের ওপর! হৃদয় আমার হায় হায় করে উঠলো। আমার এ সাধের সুট! এ যাত্রায় আমার এই একটাই সুট! কি হবে!

এ দুর্ঘটনার সুফল হলো এই, সারা পথ ওই এয়ারহস্টেস আমাকে বেশিই যত্নআত্তি করলেন।

আসলে সিংগাপুর এয়ারলাইনসের একটি বিমান প্রথমবারের মতো দীর্ঘতম সময় উড়বে আকাশে। বিমানটির মডেল এ-থৃ ফোর ফাইভ (A345) *লিডারশিপ*। সিংগাপুর থেকে এক নাগাড়ে ষোল ঘন্টা উড়ে যাবে মার্কিন আমেরিকার লস এঞ্জেলেস। ফিরতি পথে আবার উড়ে আসবে টানা আঠারো ঘণ্টায়। এটা হবে কোনো বিমানের এ যাবৎকালের বিরামহীন সবচেয়ে দীর্ঘ আকাশযাত্রা। হবে উড্ডয়নের এক নতুন রেকর্ড, নতুন ইতিহাস। সিংগাপুর এয়ারলাইনস চাইছিল এ ইতিহাসের সঙ্গী এবং *এ-থৃ ফোর ফাইভ লিডারশিপ*-এর প্রথম যাত্রী হোক বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা। তাই লস এঞ্জেলেসে আয়োজন করা হয়েছিল একটি মিডিয়া ফ্যামিলিয়ারাইজেশন প্রোগ্রামের। আর এতে যোগ দিতে বাংলাদেশ থেকে আমি আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম।

সিংগাপুরের পাচ আর আট দেশের আট সাংবাদিক ছিলাম আমরা আমন্ত্রিত। ৩ ফেব্রুয়ারির বিকাল চারটায় চাংগি এয়ারপোর্টে সিংগাপুরের পরিবহনমন্ত্রী ইয়ো চিও তং শুভেচ্ছা বক্তব্য শেষে ফিতে কেটে খুলে দিলেন *এ-থৃ ফোর ফাইভ লিডারশিপ*-এর গেট। সে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ওই বিমানের প্রথম যাত্রীদের একজন হয়ে সেই ইতিহাসের সৌভাগ্যবান সাক্ষী হলাম। আরেকজন বাঙালিও ওই ফ্লাইটের যাত্রী ছিলেন। তিনি হোটেল পূর্বাণীর স্বত্বাধিকারী আজিজুর রহমান।

আসুন দেখি বিমানটাকে

যেহেতু লম্বা সময় এ বিমানে থাকতে হবে, ফ্লাইটটি তার উপযোগীই করা হয়েছে। সেই সজ্জা ও সমূহসুবিধা দেখানোও ওতে সাংবাদিক চড়ানোর একটি কারণ। আসুন তবে দেখি। (এ-থৃ ফোর ফাইভ) *লিডারশিপ* - যাত্রীরা যাতে আরামে ভ্রমণ করতে পারেন সে জন্য ওই জাহাজের সিট সংখ্যা তিনশ তেরো থেকে কমিয়ে করা হয়েছে একশ একাশি। প্রশস্ত করা হয়েছে বসার জায়গা। র‍্যাফেল ক্লাসে দুই-দুই-দুই আসন বিন্যাসের ক্যাবিন। সিট প্রস্থে ছাব্বিশ ইঞ্চি, লম্বায় আটাত্তর ইঞ্চি। বিছিয়ে ফেলা যায় খাটের বিছানার মতোই প্রায় লম্বালম্বি। একে তাই বলা হয়েছে স্পেসবেড। বিজনেস ক্লাসে আছে ডিভিডি পোর্টস, প্রত্যেক যাত্রীর জন্য দশ দশমিক চার ইঞ্চির নিজস্ব মনিটর। মোট আসন চৌষট্টি।

আর এক্সিকিউটিভ ইকনমি ক্লাসের আসন বিন্যাস দুই-তিন-দুই। সিট আট ইঞ্চি পর্যন্ত পেছনে হেলানো যায়। মাথা ও পা রাখার জায়গা বেশ প্রশস্ত। প্রতি সিটের সঙ্গে ল্যাপটপের পাওয়ার সাপ্লাই আর নয় ইঞ্চি মনিটর। এখানে মোট আসন একশ সতেরো। দুই ক্লাসেই প্রতি যাত্রী যার যার মনিটরে দেখতে পারেন, খেলতে পারেন সাতচল্লিশটি ভিডিও গেমস, শুনতে পারেন একশ দুইটি সিডি, দেখতে পারেন আটাত্তরটি টেলিভিশন শো ও ঊনত্রিশটি সিনেমা-যখন যেখান থেকে খুশি ফরোয়ার্ড-রিওয়াইন্ড করে।

বিমানে এঞ্জিন হচ্ছে চারটি। এ-থ্ৃ ফোর ফাইভ বিমান লম্বায় দুইশ বাইশ ফুট আট ইঞ্চি। ক্যাবিনের প্রস্থ সতেরো ফুট চার ইঞ্চি। ওড়ে ঘণ্টায় ছয়শ ত্রিশ মাইল বেগে। একটানা উড়তে পারে দশ হাজার বারো মাইল। দুদল পাইলট, কো-পাইলট ও ক্যাবিন ক্রু। বিমান পরিচালনা করেন তারা পালা করে।

বিজনেস ক্লাসের সামনে একটি লাউঞ্জ। আর ইকনমি ক্লাসের একদম পেছনে আরেকটি লাউঞ্জ। যাত্রীরা খানিক হাটাহাটি করতে, দাড়াতে আর আড়মোড়া ভাঙতে পারে লাউঞ্জে। এখানে ছয়জনের মতো এক সঙ্গে হওয়া যায়। লাউঞ্জে পাওয়া যায় স্ন্যাক্স আর পানীয় যতোবার ইচ্ছা। দীর্ঘ বিমান ভ্রমণে রক্ত জমাট বেধে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এর প্রতিরোধে বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি সিটে অটো মাসাজার (Massager) আছে। এতে শরীর মাসাজ করা যায়। প্রতিদিন সিংগাপুর থেকে লস এঞ্জেলেস যায় এ বিমান, আসেও। পেরিয়ে যায় দশটি টাইম জোন আর আন্তর্জাতিক ডেটলাইন।

তিন থেকে তিন! ষোলটা জীবন থেকেই হাওয়া ...

আকাশে সময়ের হিসাব বড় বেয়াড়া। ২০০৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারির বিকাল চারটায় রওনা দিয়ে, সাড়ে ষোল ঘণ্টায় চোদ্দ হাজার সাতশ কিলোমিটার উড়ে পুরো প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ৩ ফেব্রুয়ারিই বিকাল সাড়ে চারটায় নামলাম আমরা লস এঞ্জেলেস এলএএক্স (LAX) এয়ারপোর্টে। আন্তর্জাতিক ডেটলাইনের ভেলকিতে ষোল ঘণ্টা পরও একই দিন-তারিখ!

আবার ফেরার দিন, ১৫ ফেব্রুয়ারি, লস এঞ্জেলেস থেকে একটানা আঠারো ঘণ্টা উড়ে সিংগাপুর নামলাম ১৭ ফেব্রুয়ারিতে।

আমাদের জীবনে এলোই না ১৬ ফেব্রুয়ারিটা!

ঢাকা থেকে

giasahmed@yahoo.com

আবুল বার্তা

আবুল হোসেন

আমি অল্প শিক্ষিত যুবক। সরকারি-বেসরকারি কোথাও চাকরি হলো না। শেষে বাবার এগৃকালচার ফার্ম দেখাশোনার দায়িত্ব পেলাম। পেটে-ভাতে ভালোই ছিলাম। ফার্মের আয়তন খারাপ নয়। কাজেই মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব ছিল না।

একদিন চাষ কাজের দিন মজুর এলো না। বাধ্য হয়ে লাঙলের মুঠো ধরে নিজেই ফার্মের কাজ করছিলাম। মাথার উপর চৈত্রের কাঠফাটা রোদ। গরমে বলদ দুটোর মুখ দিয়ে লালা ঝরছে।

এ সময় মাথার উপর দিয়ে একটি বিমান উড়ে গেল। বিমানটি খুব নিচ দিয়ে যাচ্ছিল। চাষ কাজ থামিয়ে একমনে বিমানের দিকে তাকিয়ে আছি। এ সময় পাশের বাড়ির গুড্ডুভাই গায়ে খোচা দিয়ে বললেন, বিদেশ যাবি?

বললাম, কিভাবে?

গুড্ডভাই বললেন, কেন, বিমানে! এই তো একটু আগে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

বিমানে চড়ে বিদেশ যাওয়ার কথা শুনে মন দুর্বল হলো। আনন্দে জমি চাষ হলো না। বলদ দুটোকে ছুটি দিলাম।

গুড্ডুভাই আমাকে সউদি আরব পাঠানোর ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এক লাখ ষাট হাজার টাকা লাগবে। কিন্তু এতো টাকা কোথায় পাবো। গুড্ডুকে দিয়ে বাবাকে বোঝাতে লাগলাম। প্রথম বছরেই চালান উঠে আসবে। পরের বছর থেকে শুরু হবে লাভের খেলা। ফাকে হজ সেরে আসতে পারলে সেটা হবে বোনাস।

বাবা রাজি হলেন। ফার্মের কিছু অংশ বিক্রি করা হলো, কিছু অংশ বন্ধক রাখা হলো। আমি প্রহর গুনতে থাকলাম কবে শুভলগ্ন আসবে, কবে বিমানে চেপে বিদেশ পাড়ি দেব। এদিকে কোনো কাজে মন বসাতে পারছি না। অর্থাৎ আমাকে দিয়ে দেশীয় কোনো কাজ করানো সম্ভব নয়।

যাহোক, দেড় বছর অপেক্ষায় থাকার পর শুভলগ্ন এলো। ভিসা লাগানো পাসপোর্ট হাতে পেলাম। সউদি এয়ারলাইন্সে চেপে সউদি আরবের পথে যাত্রা করলাম। কিন্তু কল্পনাও করতে পারিনি আমার জন্য কি দোজখ যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে সেখানে। কন্ট্রাক্ট ভিসা সম্বন্ধে যাদের সামান্য ধারণা আছে তারা আমার কষ্ট অনুমান করতে পারবেন। আমাকে এক গৃহস্থের কাছে তিন বছরের মেয়াদে বিক্রি করা হয়েছে, মানে আমি এই মনিবের ক্রীতদাস। আমার পাসপোর্ট গৃহস্থের কাছে জমা দেয়া হয়েছে। পালানোর কোনো উপায় নেই।

কিছুদিন যেতেই আমার ফর্শা শরীর মরুভূমির গরমে কালচে হলো। খানাপিনা মিসকিনদের বরাদ্দের মতো। মাস শেষে বেতন চাইলাম।

মনিব চোখ কটমটিয়ে বললো, তোমার কাজ মোটেও সন্তোষজনক নয়। তুমি খেজুরের ডালগুলো সাইজ মতো কাটতে পারো না। দুম্বাগুলোর চেহারা এখনকার চেয়ে আগেই ভালো ছিল।

অর্থাৎ বেতন না দেয়ার ছুতো।

একদিন সাহস করে বোরখাওয়ালী গৃহকর্ত্রীকে ইশারায় কষ্টের কথা জানালাম।

গৃহকর্ত্রী আমাকে একটি রোগা দুম্বা দেখালেন। বললেন, কোরবানির ঈদে এই দুম্বাটি বিক্রি করে তোমাকে কিছু রিয়াল দেয়া হবে।

এদিকে বাড়িতে চিঠি পাঠাবো সেই পয়সাও নেই। এভাবে অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে তিন বছর পার হলো। একদিন রিক্ত হাত, সিক্ত চোখে বাড়ি ফিরলাম।

আবার সেই সউদি এয়ারলাইন্স। বিমান ভ্রমণের মজা পেয়েছি ফেরার পথে। তবে তা বিমানে ওড়ার জন্য নয়, মরুভূমিতে প্রাণ না হারিয়ে মা-বাবার কাছে ফিরে আসার জন্য।

তাই আমার মতো সব ভাইদের বলছি, যারা বিমান ভ্রমণের শখ মেটানোর জন্য বিদেশ যাওয়ার কথা ভাবছেন তারা একটু ভাবুন, বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ রুটে অনেক বিমান চলাচল

করে। দুই–আড়াই হাজার টাকা খরচ করলে যে কেউ যশোর থেকে ঢাকায় চলাচল করতে পারবেন। তার জন্য লক্ষাধিক টাকা খরচ করে দোজখের আজাব ভোগের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া বিমান ভ্রমণ আহামরি মজার কিছু নয়। বারো হাজার ফিট উপরে ওঠার পর মনে হবে বিমানটি ঘুড়ির মতো স্থির হয়ে দাড়িয়ে আছে। কেবল রানওয়ে স্পর্শের সময় বোঝা যায় বিমানটি কতো বেগে আসছিল।

তারপরও প্রথম আকাশপথে ভ্রমণ।

এর অনুভূতিই আলাদা।

চুয়াডাঙ্গা থেকে

বেলি ল্যান্ডিং

দেলওয়ার হোসাইন

আমার জীবনে প্রথম বিমানে ওঠা সম্ভবত স্বাধীনতাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে। তা না হলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের শেষ দিকে। সে বিমান চড়া কোনো ভ্রমণের প্রয়োজনে নয়, নেহায়েত শখের বশে। সে সময় আমার মতো ত্রিশ বছর বয়সী মোটামুটি শিক্ষিত যুবকরা আর কোথাও না হোক প্লেনে দেশের পশ্চিম অংশ দেখার জন্য সাবেক পাকিস্তানে গিয়ে থাকবে।

নোয়াখালীর স্বল্প শিক্ষিত সিরাজুল্লাহ, বরকতউল্লাহ আর খেদমতউল্লাহরা সেখানে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতো। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে তালাত না হোক দেশি ভাইয়েরা যে পদেই থাকুক তাদের আপন ভাইয়ের মতো গ্রহণ করতো, কোনো কাজে প্রভাইড করতো। যাওয়ার প্লেন ভাড়া? সেটা কোনো ব্যাপারই ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে এক বিড়া পান সঙ্গে নিয়ে গেলেই বিমান ভাড়া উঠে যেতো। আমার জন্য এমন প্লেনে না চড়া ছিল লজ্জার বিষয়।

তৎকালীন বৃহৎ এক জেলার সদর এয়ারপোর্ট থেকে শহরের বাইরের এক ছোট বন্দরে যাওয়ার প্ল্যান করি। ওই এয়ারপোর্টে নামার উঠানটি বলা যায় নালা–টিলাঘেরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পরিত্যক্ত এক অপ্রশস্ত এবং অমসৃণ নাতিদীর্ঘ বিরানভূমি। গালভরা বুলিতে যাকে বলা হয় রানওয়ে। জেলা হেড কোয়ার্টার থেকে দশ টাকার টিকেট কেটে চড়েছিলাম সে বিমানে। সেটা কি ফকার ফ্রেন্ড শিপ বিমান ছিল নাকি হেলিকপ্টার জাতীয় কোনো উড়নযন্ত্র ছিল তা মনে নেই।

নিচের দৃশ্য দেখবো বলে জানালার পাশে বসেছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিমান উড়াল দিয়ে ধাই করে আকাশে উঠে গেল। ভালো করে নিচে দেখার আগেই গাছপালা, ঝোপঝাড় সবুজ চাদরে ঢাকা বিরাট প্রান্তরে রূপলাভ করলো। এর মাঝে মাঝে দেখা গেল বড় আকারে পিড়ির মতো আয়তাকার এবং বর্গাকৃতির কাঠের টুকরো সাজানো। এসব কাঠের টুকরোর ফাকে ফাকে খেলনার মতো খড় বা টিনের ঘর। বুঝতে পারলাম কাঠের টুকরোগুলো হলো শস্যের মাঠের বিভিন্ন আকৃতির খণ্ডিতাংশ। খেলনা ঘরগুলো গ্রামের দিশা।

একই জেলার এক এয়ারপোর্ট থেকে আরেক এয়ারপোর্টের ভাড়া ছিল মাত্র দশ টাকা। জেলাটির নাম উল্লেখ করলাম না। এ ধাধাটির ভার পাঠকের ওপর ছেড়ে দিলাম। প্রসঙ্গত, তখন ঢাকা–কুমিল্লায়ও প্লেন চলাচল ছিল। ভাড়া বিশ টাকা। এ প্রজন্মের পক্ষে সেসব অবিশ্বাস্য সত্য ঘটনা বিশ্বাস করা কঠিন হবে। কিন্তু সে কথা স্মরণ হলে আমাদের বুক থেকে স্বগতোক্তি বেরিয়ে আসে – *হারালো কোথা সেই দিনগুলি।*

এরপর অফিসের প্রয়োজনে সেই জেলা থেকে বহুবার ঢাকা গিয়েছি এবং ফিরে এসেছি ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমানে। মাত্র পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায়। সময় লাগতো চল্লিশ–পয়তাল্লিশ মিনিট।

১৯৭৪ সালে একবার ওই জেলা থেকে ঢাকা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে গিয়ে ধরা পড়লো বিমানের পা নামছে না। সামনের দুই চাকা জ্যাম হয়ে গিয়েছে। বিমান চাকা দুটির মান ভাঙানোর জন্য ঢাকার আকাশে বার বার চক্কর দিতে থাকলো। যাত্রীদের কিছু জানানো হলো না।

তারা যখন ক্রুদের চাপ দিলেন ব্যাপার কি, ক্রুরা তখন মুখ খুললেন।

বিমানের চাকা আটকে গেছে। তেল নিঃশেষ করে প্লেন বেলি ল্যান্ডিং (Belly Landing) বা চাকা ছাড়া প্লেন নামবে।

সে বছর আমার স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ে সঙ্গে ছিল। আমরা ধরে নিলাম বেলি ল্যান্ডিং মানে প্লেন ক্র্যাশ। মৃত্যু অবধারিত। সবার অন্তরাত্মা খাচায় থাকার কথা নয়। সে সময়ের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা হয়তো যায়। তবে তার জন্য শক্তিশালী কলমের জোর দরকার যার ছিটেফোটাও আমার নেই।

প্লেন তেল পোড়াতে আদমজী মিল, নারায়ণগঞ্জ শহরসহ ঢাকার আশপাশে দেড় ঘণ্টা চক্কর দিল। সম্ভবত আমাদের সঙ্গে এমন একজন বুজুর্গ ছিলেন যার পুণ্যের ফলে বিমানের পা ঠিক হয়ে গিয়েছিল। সিনেমার ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যে যেমন দুই পা অবশ নায়ক বা কোনো প্রধান চরিত্র নায়িকা কিংবা নায়িকার মায়ের কোনো পীরের মাজারে বা দেব–দেবীর মন্দিরে দোয়া চাওয়ার ফলে আকস্মিক বিছানা থেকে নেমে হাটতে থাকেন, আমাদের প্লেন তেমনি তার গুটানো পা দুটি আস্তে আস্তে নিচে নামিয়ে দিল।

ক্রুরা খবরটি জানাতেই সবার বাধভাঙা অশ্রু দুই চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকলো।

জীবনের ফুলে ফলে সুশোভিত অধ্যায়ে যে ভয় পেয়েছিলাম প্লেনে চড়ে, সে ভয়ের চিহ্ন মাত্র ছিল না জীবনের শেষ ভাগে যখন পৃথিবীর প্রায় সব সাগর, মহাসাগর লম্বালম্বি, পাশাপাশি এবং কোনাকুনি প্লেনে অতিক্রম করতে হয়েছে বহুবার। ব্রাজিলের সাও পাওলো থেকে রিও ডি জেনিরো হয়ে প্যারিস, ইওরোপ থেকে আমেরিকা। আমেরিকা থেকে ইওরোপ। ঢাকা থেকে সিংগাপুর। সিংগাপুর থেকে জাপান ছুয়ে আলাস্কার পাশ দিয়ে ভ্যানকুভার হয়ে কানাডার মধ্য দিয়ে এক নাগাড়ে সাড়ে আঠারো ঘণ্টায় নিউ ইয়র্ক। নিউ ইয়র্ক থেকে গৃনল্যান্ড, তাসখন্দ ছুয়ে ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মুম্বাই, মাদ্রাজ হয়ে আবার সিংগাপুর। জীবনানন্দ দাশের মতো কল্পনায় নয়, বাস্তবে হেটেছি বিমানে। ছিল এয়ারহস্টেস চর্ব–চোষ্য, লেহ্য–পেয়র আপ্যায়নের অবারিত হাত আর প্লেনের ছিমছাম পরিবেশের আনন্দ।

গোপীবাগ, ঢাকা থেকে
dhossain1@yahoo.com

করাচির মেয়ে

মোহাম্মদ আবদুর রহীম

১৯৬২। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের একজন কর্মকর্তা ছিলাম। আমার পোস্টিং ছিল কুমিল্লা জেলার চাদপুরে। একদিন হঠাৎ করে ডাক পেলাম আমার হেড অফিস ঢাকায়, গেলাম ঢাকায়।

পরিচালক বললেন, তোমাকে বিভাগীয় শিক্ষা সফরে পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে হবে এক মাসের জন্য। টিকেট কেনা হয়ে গেছে। এই তোমার টিকেট। ১৫ ডিসেম্বর ফ্লাইট। পাকিস্তান এয়ারলাইন্সে প্রথমে যাবে করাচি। সেখানকার কর্তৃপক্ষ তোমার পরবর্তী প্রোগ্রাম নির্ধারণ করবে। তুমি ১৪ ডিসেম্বর হেড অফিসে রিপোর্ট করবে। অফিসের গাড়িতে এয়ারপোর্টে যাবে। প্লেন ছাড়বে রাত আটটায়।

১৫ ডিসেম্বর এয়ারপোর্টে আনুষ্ঠানিকতা সেরে প্লেনে উঠি। বোয়িং সেভেন-ও-সেভেনের বিরাট পরিসর। সারি সারি গদি আটা চেয়ার। খুবই আরামদায়ক। এয়ারহস্টেসরা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছেন। কিভাবে বেল্ট বাধতে হবে তা দেখিয়ে দিলেন এক এয়ারহস্টেস। অক্সিজেন মাস্ক-এর ব্যবহারও দেখালেন। ইতিমধ্যে প্লেন উড়লো আকাশে। চুপ করে বসে রইলাম।

এক এয়ারহস্টেস দৈনিক পত্রিকা দিয়ে গেলেন। বিভিন্ন রকমের ম্যাগাজিন পড়তে দিলেন। সফট ড্রিংকস দিয়ে গেলেন। যাত্রীদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না তার খোজখবর নিলেন। ঘণ্টা খানেক পর এক এয়ারহস্টেস রাতের খাবার পরিবেশন করলেন। আমার পাশের সিটে একজন হিন্দু ভদ্রলোক বসলেন। তার সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি বললেন, আমি কিছুই খাবো না। আমি একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ।

খাওয়ার পালা শেষ। কিছুক্ষণ পর এয়ারহস্টেস খাবার ট্রেগুলো নিয়ে নিচ্ছেন। একজন এয়ারহস্টেস এলেন আমার টেবিলের সামনে। যখন ট্রে টান দিলেন তখনই হিন্দু ভদ্রলোকের ট্রের খাবার ছলকে গিয়ে পড়লো আমার গায়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ঝন ঝন করে উঠলো খাবারের ডিশ। মুহূর্তে আমার পরিধানের সমস্ত কাপড়-চোপড় এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেল যে তা আর পরার কোনো যোগ্য নেই। বিশ্রী অবস্থা। নোংরা হয়ে গেল চা, কফি, সুপের দাগে। বড় বড় দাগ। কি যে অবস্থা কল্পনা করা যায় না।

এয়ারহস্টেস হতবাক ও স্তম্ভিত। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমার সামনে দাড়িয়ে। তখন তার করুণ অবস্থা। তিনি এই মুহূর্তে কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ঠায় দাড়িয়ে রইলেন। কিন্তু কারো কিছু করার ছিল না তখন।

অন্য একজন হস্টেস এসে পড়ে যাওয়া কাপ প্লেট উঠিয়ে নিলেন। হঠাৎ এয়ারহস্টেস দৌড়ে ক্যাবিনে গিয়ে একটা মোটা টাওয়েল গরম পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে এলেন এবং আমার গায়ে মৃদু চাপ দিতে লাগলেন যাতে দাগগুলো শুকিয়ে যায়। আমাকে দাড়াতে বললেন।

তিনি আরো ভালো করে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আমার কাপড়ে চাপ দিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তার সুন্দর হাত আমার গা স্পর্শ করলো কয়েকবার। শিহরণ অনুভব করতে লাগলাম।

এয়ারহস্টেসকে আশ্বস্ত করে বললাম, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন তো আর কিছু করার নেই। আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। অসুবিধা শুধু একটাই হবে। কাল আমার সেমিনারে যোগদান করার কথা সকাল আটটায় কি যে করি।

এয়ারহস্টেসকে বললাম, আপনি যান। প্লেন থেকে নেমে একটা কিছু করতে হবে।

যথাসময়ে প্লেন করাচি এয়ারপোর্ট স্পর্শ করল।

প্লেন থেকে নেমে ডিপারচার লাউঞ্জের দিকে যেতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় সেই এয়ারহস্টেস দ্রুতবেগে আমার দিকে ধেয়ে এলেন।

তিনি বললেন, আপনার তো খুব ক্ষতি করেছি। চলুন আমার বাসায়। পুষিয়ে দেবো।

চুপ করে দাড়িয়ে রইলাম। চিন্তা করছি কি করবো।

তিনি বললেন, চিন্তার কিছু নেই। আপনি ভয় পাচ্ছেন। ভয়ের কিছু নেই। এক রাতের জন্য আমার বাসায় অতিথি হবেন। বাসায় আমার ভাইয়ের কাপড় আছে। সেগুলো পরে আপনি সেমিনারে যাবেন। আমার গাড়িতে আপনাকে সম্মেলন স্থলে পৌছে দেবো।

না না, তা কি করে হয়। আমি চিনি না জানি না কিছুই।

কিছুই হবে না, চলুন তো। খুব পীড়াপীড়ি শুরু করলেন।

শেষ পর্যন্ত রাজি না হয়ে পারলাম না, গেলাম তার বাসায়। বিরাট বাড়ি। গেটে দারোয়ান। গেট খুলে দিল। অতি সন্তর্পণে তাকে অনুসরণ করলাম। আমাকে ড্রইংরুমে বসতে দিয়ে ভেতরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তার মা, বাবা, ভাবী এবং ভাই এলেন। সবার সঙ্গে পরিচিত হলাম। ইতিমধ্যে টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। খেতে খেতে কথা প্রসঙ্গে বললাম, আমার নাম রফিক। বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়।

তার বাবা বললেন, আমরা বাঙালি, বাড়ি বরিশালে। ১৯৪৭ সাল থেকে করাচিতে ব্যবসা করছি। এখানে ভালো আছি।

আদর আপ্যায়নের ত্রুটি রইলো না।

বোকার মতো প্রশ্ন করলাম, এতো কিছু হলো। কিন্তু আপনার মেয়ের নাম জানা হলো না।

হাস্যরোল পড়ে গেল।

তিনি বললেন, আমার নাম সেলিনা। সবাই শেলী বলে ডাকে। আমরা এক ভাই এক বোন।

তারপর তার ভাইয়ের কাপড় এনে দিলেন।

পরলাম। চমৎকার ফিট করেছে।

সেলিনার বাবা বললেন, বিমানের এই দুর্ঘটনার জন্য আমরা সবাই দুঃখিত।

বললাম এতে সেলিনার কোনো দোষ ছিল না। এটা অ্যাকসিডেন্ট মাত্র।

সেলিনার বাবা মি. শফিক অমায়িক লোক। মেয়েকে বললেন, আমার শোবার ব্যবস্থা করতে। অ্যাটাচড বাথরুমের একটি রুমে থাকতে দেয়া হলো। পানির গ্লাস, জগ রেখে দিলেন সাইড টেবিলে। বাথরুমে দেয়া হলো সুগন্ধি সাবান এবং আনকোরা টাওয়েল।

সেলিনা বললেন, এবার যাই। আপনি ঘুমান।

সকাল সাতটায় সেলিনা আমাকে ঘুম থেকে ডেকে দিলেন, তাড়াতাড়ি করুন। আটটার মধ্যে আপনাকে সেমিনারস্থলে আমার গাড়িতে পৌছে দেবো।

নাশতা খেয়ে আমি রেডি। সেলিনা নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করলেন। যেতে যেতে সেলিনা বললেন, আপনি চুপ কেন? কথা বলছেন না কেন? এখনো আমার ওপর রাগ করে আছেন।

আমি বললাম, রাগ নয়, অনুরাগ। আপনার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। সত্যি মুগ্ধ। আপনার আতিথেয়তা মনে রাখবো।

কতোদিন মনে রাখবেন। আপনি যতোদিন মনে রাখবেন ততো দিনই। আপনাকে খুব ভালো লেগেছে।

সেলিনা বললেন, দেখা যাবে কে কাকে কতোদিন মনে রাখে।

সত্যি আপনাকে খুব ভালো লেগেছে।

ইতিমধ্যে সম্মেলন স্থলে উপস্থিত হলাম। সেলিনা বললেন, বিকাল পাচটায় আপনার সম্মেলন শেষে আমি আপনাকে নিয়ে যাবো। দেখুন, অন্য কোনোদিকে যাবেন না আবার।

আর কি তা হয়। স্কাউট ভবনে সেমিনারে উপস্থিত হলাম। কথা মতো ঠিক পাচটায় সেলিনা এসে উপস্থিত। আমাকে নিয়ে গেলেন তার বাসায়। যতোদিন করাচি থাকেন ততোদিন আপনার সঙ্গে আছি এবং পরবর্তী প্রোগ্রামেও আপনার সঙ্গে থাকবো।

তা কি করে হয়, আপনার ডিউটি আছে না?

এক মাসের ছুটি নিয়েছি। পরদিন নিয়ে গেল ক্লিফটন সমুদ্র সৈকতে। সেখানে আর কেউ নেই। আমি আর সেলিনা।

সেলিনা বললেন, আমি গান গাইতে এবং আবৃত্তি করতে পারি।

পর পর তিনটি রবীন্দ্র সংগীত শোনালেন।

সুদূর করাচিতে একজন সুন্দরী ললনার মুখে রবীন্দ্র সংগীত শুনে আমি মুগ্ধ। আমার আবেগ সামলাতে পারলাম না। হঠাৎ করে জড়িয়ে ধরে সেলিনাকে চুমুর পর চুমু দিতে লাগলাম। সেও আমাকে চুমুতে ভরিয়ে দিল।

তারপর সেলিনা বললো, তোমাকে আর ছাড়ছি না। যেতে দেবো না পূর্ব পাকিস্তানে। থাকবে আমার কাছে।

তা কি করে হয়।

যেতে নাহি দিব তবু যেতে দিতে হয়।

তারপর আমরা উভয়ে প্রফুল্ল চিত্তে সেলিনাদের বাড়িতে এলাম।

সেলিনার বাবা-মা এলেন, বাবা মেয়ের প্রশংসা করলেন। একটি মাত্র মেয়ে। পরিবারের সবাই সেলিনাকে আদর করে। আদরের দুলালী। এভাবেই করাচিতে কাটলো পাচ দিন। তারপর করাচি থেকে আমার পাঞ্জাবে লাহোরে যাওয়ার প্রোগ্রাম।

সেলিনা বললো, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

লাহোর থেকে রাওয়ালপিন্ডি যাবো।

আমিও যাবো। আমাকে নেবে না?

কিন্তু তোমার মা-বাবা?

তাদের স্বীকৃতি আছে, তাই তো বলছি।

ছিলেন আপনি এখন হয়ে গেছ তুমি। সুতরাং বুঝতেই পারছো আমাকে যেতেই হবে তোমার সঙ্গে।

এ যেন এক ভালোবাসার বাধভাঙা জোয়ার। লাহোরে দুইজন খুব আনন্দে দিন কাটালাম। দেখলাম লা-দারা গার্ডে। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের স্মৃতিসৌধ। গেলাম পিন্ডিতে। দেখলাম জাতীয় পার্ক, তক্ষশীলা ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান। তারপর পেশোয়ার, খাইবার পাস, লান্ডি কোটাল তুরকাম বর্ডার পর্যন্ত। এবার করাচিতে ফেরার পালা। পশ্চিম পাকিস্তান টুর শেষ। আমারো দিন শেষ। এবার পূর্ব পাকিস্তান ফিরতে হবে।

সেলিনার মন খুব খারাপ। বললো, তোমার না গেলে হয় না?

তা কি করে হয়?

ভালোবাসার জন্য সব কিছু হয়। তাহলে বুঝবো তুমি আমাকে ভালোবাসো না।

ভালো তো বাসি। দেশে আমার মা–বাবা আছেন। তাদের কে দেখবে? আমি তো আমার দেহ–মন সবই উজাড় করে দিয়েছি, তবে কেন?

ফেরার দিন সবাই এক সঙ্গে খেলাম। সেলিনার বাবা মুখ ফুটেই বললেন, সেলিনা তো তোমাকে ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। মেয়েকে সামলাবো কিভাবে।

ঠিক আছে, আবার আসবো।

সেলিনার কি কান্না। তার নাওয়া–খাওয়া বন্ধ। একদম নীরব নিশ্চুপ। একবার ভাবলাম থেকেই যাই আর কিছুদিন। কিন্তু না। হলো না। এলাম এয়ারপোর্ট। সবাই বিদায় দিতে এলো। সকলের অশ্রু ছলছল করছে। প্লেনে ওঠার ঘোষণা হলো। এক পা দুপা করে এগোচ্ছি বিমানের দিকে। পা আর সামনে চলে না। ইচ্ছা হচ্ছে ফিরে যাই তাদের মাঝে। ডুবে যাই সেলিনার ভালোবাসায়। কিন্তু যেতে তো আমাকে হবেই।

কোথায় যেন পড়েছিলাম যুদ্ধ ক্ষেত্রে বোমার আঘাতে সৈনিকের হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অ্যাম্বুলেন্স এসে তার দেহটা নিয়ে গেল। সৈনিক শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলো।

আমারো অবস্থা সেই রকম। হঠাৎ মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের সেই চিরন্তন বাণী, *জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ কত মৃত্যু আছে। ফিরিয়া লাভ কি? পৃথিবীতে কে কাহার।*

প্লেন ছাড়লো। ইচ্ছা হলো প্লেন থেকে লাফ দিই আর চিৎকার করে বলি সেলিনা এই দেখ আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি।

সানকীপাড়া, ময়মনসিংহ থেকে

গ্রেফতার

মোহাম্মদ আবু জাবেদ রুবেল

আট বছরের পেশাগত জীবনে বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করতে হয়েছে। হং কং, চায়না, ম্যাকাও, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, বৃটেন। তাই বিভিন্ন এয়ারলাইন্সে চড়ার সুযোগ হয়েছে। যেমন বাংলাদেশ বিমান, থাই এয়ারলাইন্স, সিংগাপুর এয়ারলাইন্স, ড্রাগন এয়ারলাইন্স, ক্যাথে প্যাসিফিক, চায়না এয়ারলাইন্স, এয়ার ইনডিয়া, বৃটিশ এয়ারওয়েজ। ফলে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়েছে।

যাত্রীদের বসার স্থান দুভাগে নির্ধারণ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে বিজনেস ক্লাস, অপরটি ইকনমি ক্লাস। তাই এর ভাড়া ও সেবাগত মান ভিন্ন। প্রতিটি যাত্রীর মাথার ওপরে হ্যান্ড লাগেজ রাখার ব্যবস্থা আছে। বিমান ছাড়ার আগ মুহূর্তে এয়ারহস্টেস কিভাবে সিটবেল্ট এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার করতে হয় তা বর্ণনা করেন এবং স্ক্রনে দেখানো হয়। সিটের সামনে নিরাপত্তা বা বিপদ সংকেত দেখানো সংবলিত ছোট ফোল্ড করা পেপার আছে।

বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের খাদ্য ও পানীয় বিভিন্ন রকমের। কিছু এয়ারলাইন্সের খাবারের মান খুবই ভালো। তবে পানীয়ের ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, মাঝে মাঝে কিছু যুবক (যদি প্লেনে নতুন হয়) না বুঝে কিংবা বুঝে এক সঙ্গে বিয়ার, জিন, ভদকা প্রভৃতি মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে, এমনকি বমি করে যা যাত্রীদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়। বিনা পয়সায় পাওয়া পানীয় ছেড়ে দেবে কেন?

প্লেন ওড়া এবং নামার সময় জানালা দিয়ে নিচে দেখতে ভালো লাগে। ছোট ছোট বাড়িঘর, পাহাড়, পর্বত। ঠিক যেন মানচিত্র দেখছি।

সবচেয়ে যে জিনিসটা উল্লেখযোগ্য তা হলো ভিন্ন কালচারের মানুষের সান্নিধ্য পাওয়া। পাশে সুন্দরী কিংবা আকর্ষণীয় মহিলা পেলে গল্প-গুজব ভালো জমে। তবে এর ব্যতিক্রমও ঘটে। একবার এক বৃদ্ধ আমার পাশে বসেছিলেন বাংলাদেশ-হং কং রুটে। বিমান যখন একদম উপরে উঠে গেল মানে মেঘের উপরে তখন আমাকে বললেন, *বাজান, শাদা মেঘ গুলান দেখ, আমার গাছের শিমুল তুলার নাহান, বড় ছুতে ইচ্ছা করে।*

আমারও লোভ হলো। জীবনের কতো কিছুই না এ রকম না ছোয়া থেকে যায়। একবার তাইওয়ান থেকে হং কং আসার সময় পরিচয় হয়েছিল ইনডিয়ান এক মেয়ের সঙ্গে। নাম তামান্না। খুবই ভালো লাগলো তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে। এক সময় তার প্রেমিকের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। খুব টানাপড়েনে তাদের সম্পর্কের ইতি ঘটতে যাচ্ছে। সেও আমাকে আমার ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করলো।

সে আমাকে বললো, তোম ঢ্যাসে পেয়ার করো, উসকো তোম ছোড় দো, আভি সাচ্চা তোমকো পেয়ার করে গা উসকো দিল পার তোমারি লিয়ে কুছ হ্যায় অভি উয়াফেস আয়েগা তোমারি পাস, জরুর আয়েগা।

উত্তরে বললাম, কভি আয়েগা, হামারা গুজার জানেকা বাদ।

এ ব্যাপারে তাকে একটি জোকস বললাম,

মেনে উসকো দিল দিয়া নাদান সামাঝকার

উসি উসকো খা লিয়া বাদাম সামাঝকার,

মেনে উসকো দিল দিয়া তোফা সামাঝকার,

উসি উসে বৈঠ গিয়া সোফা সামাঝকার।

বিমানে অনেক সময় অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে। উল্লেখ করার মতো একটি ঘটনা বলি। হং কং থেকে বাংলাদেশ আসছি বাংলাদেশ বিমানে। এখানে বলা প্রয়োজন অধিকাংশ যাত্রী ছিল কলকাতার। কারণ ফ্লাইটটি হং কং-ঢাকা-কলকাতার।

সকল প্যাসেঞ্জার যখন বসলো, বিমানের পেছনের দিকে সব সময় কলকাতার লাগেজ ব্যবসায়ীরা বসে। তারা বিমানে বসেই তাদের লাগেজ প্যাককরণ শুরু করলো আর ব্যবহার করতে লাগলো গাম ট্যাপ। বিশ্রি রকমের আওয়াজ।

একজন বাংলাদেশি তাদের একটু আস্তে আস্তে প্যাক করতে বললে তারা খুব গালিগালাজ করতে লাগলো। এক পর্যায়ে তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো, বাংলাদেশ বিমান আমাদের টাকায় চলে।

তখনো বিমান ওড়েনি। চিৎকার শুনে বাংলাদেশ বিমানের স্টেশন ম্যানেজার এলেন ঝগড়া থামানোর জন্য। এক পর্যায়ে কলকাতার তিন চারজন যাত্রী স্টেশন ম্যানেজারকে ধাক্কা দেয়। এতে আমরা (সকল বাংলাদেশি) ক্ষুব্ধ হই। সবাই দাড়িয়ে গেলাম। প্রায় সত্তর আশিজন। প্রয়োজনে আমরা ফ্লাইটে যাওয়া বাতিল করবো ঘোষণা দিলাম। স্টেশন ম্যানেজারকে ধাক্কা দেয়াটা মনে হলো আমাদের দেয়া হলো।

এদিকে নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পার হয়ে গেলেও বিমানের দরজা ক্লোজ করা যাচ্ছিল না। অবশেষে আমাদের জয় হলো। পাইলট স্পেশাল সিকিউরিটি অফিসার কল করলেন। তারা আসার পরও সেই দোষী ব্যক্তিরা চিৎকার করতে লাগলো, কোনো ধরনের নমনীয়তা তাদের মধ্যে

দেখা গেল না। সেই চারজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হলো। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

লন্ডন থেকে
jabedhk@hotmail.com

নতুন দম্পতি

মহিউদ্দীন জুয়েল

ক্লাস ফাইভে উঠেছি। ক্লাস শুরু হতে কয়েক মাস বাকি। এ সময় হঠাৎ ইংল্যান্ড থেকে বড় মামা বাড়িতে এসে হাজির। সঙ্গে মামি, মামাতো ভাই ও বোন। দিন পনেরো ছুটি নিয়ে বেড়াতে এসেছেন।

একদিন সন্ধ্যায় মামা আমার পড়ালেখার খোজখবর নিচ্ছিলেন। ক্লাসে কেমন পারফর্ম করি জিজ্ঞাসা করলেন। জানতে চাইলেন রোল নাম্বার কতো।

প্রথম হয়েছি এ কথা তাকে বলতেই তিনি খুশিতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, ভাগ্নে, তোর কোনো ইচ্ছা আছে? থাকলে জলদি বলে ফেল।

মামাকে কাছে পেয়ে দীর্ঘ দিনের সুপ্ত সাধ পূরণের জন্য মন আনচান করছিল। অকপটে জানিয়ে দিলাম, *প্লেনে চড়তে চাই*।

তিনি বললেন, ঠিক আছে। তোর মাকে গিয়ে বল।

যদি রাজি থাকে তবে তিন মাসের জন্য ইংল্যান্ড থেকে বেড়িয়ে আসিস। *থ্যাংক ইউ মামা* জানিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললাম। মা শুরুতে রাজি হননি।

পরে মামা–মামির পীড়াপীড়িতে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন। জীবনের প্রথম বিমানে চড়ার খবরটা স্কুলের ক্লাসমেটদের কাছে চাউর করে দিলাম।

কয়েকজন থেকে আবার ভ্রমণ সম্পর্কিত উদ্ভট প্রশ্নের উত্তরও জেনে নিলাম। আমার খাওয়া–দাওয়া, উচ্ছলতা তখন আকাশ ভ্রমণকে ঘিরে।

দিন যতোই ঘনিয়ে আসতে লাগলো খুশির বাধ যেন উপচে পড়তে থাকে। এরই মধ্যে কনফার্ম করা হলো আমাদের যাওয়ার বিষয়টি। শেষ সপ্তাহের রাতেই ছিল ফ্লাইট।

বাবা আমাকে দুষ্টমি না করে চুপচাপ সিটে বসে থাকার পরামর্শ দিলেন। সন্ধ্যার পর পরই আমরা এয়ারপোর্টে চলে যাই। কিছুক্ষণ পর বিমানে উঠি। সে কি শিহরণ।

সব কিছু স্বপ্নের মতো মনে হতে লাগলো। যেন আমিই পাইলট। বসা মাত্রই মামা আমাকে বেল্ট পরিয়ে দিলেন। সাবধান করলেন যাতে এখান থেকে না উঠি।

আমার পাশে বসলো মামাতো ভাই অন্তু। বিমান উড়তে শুরু করেছে। ভেতরের সব লাইটের সুইচ অফ করা হয়েছে। যাত্রীদের অনেককেই দেখলাম হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে। কেউবা চোখ বুঝে চিন্তায় মগ্ন। উপায়ান্তর না দেখে চুপচাপ বসে থাকার চেষ্টা করলাম। এ সময় আমার সামনের সিটে বসা এক জোড়া নব দম্পতির দিকে চোখ আটকালো। নতুন বিয়ে হয়েছে। ছোট ছিলাম। পুরোপুরি অনভিজ্ঞ। তাই তারা কি করছিল তা বুঝতে পারছিলাম না। আলো–আধারির ছায়ায় তাদের কাজের কৌশলের অনেক কিছুই পেছনে বসে দেখছিলাম।

ছেলেটি পায়জামা–পাঞ্জাবি পরিহিত। অপরদিকে তার বৌটি সেজেছে ভীষণ করে। হাতে চুড়ি, কপালে টিপ, চোখে কাজল, মাথায় কারুকাজ করা খোপা, পরনে লাল শাড়ি, ম্যাচ করা ব্লাউজ সঙ্গে ভেতরের অংশ। ছেলেটিকে দেখলাম কাজের ব্যাপারে দক্ষতা দেখাতে আর মেয়েটির মজা উপভোগ করার দৃশ্য দেখে বোঝা যাচ্ছিল আহা কি পরিতৃপ্ত, মধু লগ্ন!

তারা এমনভাবে কাজটি করছিল এই ভেবে যেন কেউ দেখছে না। গভীরভাবে আড়ষ্ট হয়ে বসার ধরন দেখে বোঝার উপায় নেই আসলে এই নর–নারীর মধ্যে কি চলছে।

নতুন দম্পতিদের বিয়ে পরবর্তী আদর–সোহাগ বুঝি এভাবে আকাশেই শুরু হয়। আমার কচি মনে এ প্রশ্নটি তখন উদয় হচ্ছিল।

ছেলেটি খুব সুচারুরূপে মেয়েটির শরীর স্পর্শ করছিল। এক হাত তার কাধে রেখে অন্যটি আস্তে করে শাড়ির নিচে ঢুকিয়ে দিল। দেখলাম আগুনের লেনিহান শিখার মতো তীক্ষ্ণ মসৃণ খাড়া স্তন দুটিতে হাত রেখে কি তাণ্ডবই না চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি!

এ দৃশ্য দেখে আমার চোখ তো এক লাফে তাল গাছে। মেয়েটির হাত, ঠোট, গলা, চিবুক এমনকি পেটের কোনো অংশই এ থেকে বাদ যাচ্ছিল না।

চুমুর পরশে সে চোখ বন্ধ করে অস্ফুট স্বরে আওয়াজ করতে থাকলো। একই স্থানে মেয়েটিকে বসে থাকার পাত্রী বলে মনে হলো না।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলাম সেও ছেলেটির কাজের পাল্টা উত্তর দিচ্ছিল সাহসী হয়ে। তিনি আরো চুমুর বন্যা বয়ে দিতে লাগলেন। কখনো তার পরিপক্ক স্বামীর হাত দুটো ধরে নিতম্বের ওপরে আবার কখনো বুকের ওপর জোর করিয়ে বসিয়ে দিতে লাগলেন। এক পর্যায়ে লক্ষ্য করলাম তারা দুজনেই বেশ উত্তেজিত।

কৌশলে গভীরে যাওয়ার জন্য মেয়েটি ছেলেটিকে চাপ দিতে থাকলো। বিধি বাম! দুই হাত সিটে সম্ভব নয় দেখে ছেলেটি চুপসে গেল। কিন্তু মেয়েটিকে দেখলাম বেশ তৎপর হতে। সে যতোই এ ব্যাপারে তার স্বামীকে দক্ষতা দেখাতে বলছে তিনি ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চার মতো ততোই অসহায়ত্ব প্রকাশ করছেন!

তাদের এ মান–অভিমানের খেলা দেখে ভাবলাম হয়তো মেয়েটি অসুস্থ। তাই তার কর্তব্যপরায়ণ স্বামী শরীর টিপে দিচ্ছেন। কিন্তু এতো জায়গা থাকতে তিনি কেন মেয়েটির উপরের অংশের দিকে হতে দিয়েছিলেন বুঝতে পারছিলাম না। একইভাবে স্বামীটিকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়ার রহস্যেরও কূল–কিনারা করতে পারলাম না।

হঠাৎ তাদের জোরাজুরির এক পর্যায়ে আমার চোখে চোখ পড়লো মেয়েটির। তিনি কিছুটা বিব্রতকর অনুভব করে শাড়ি গোছাতে ব্যস্ত হলেন।

পেছন ফিরে বললেন, কি বাবা, তুমি ঘুমোওনি। বড়দের এসব কাজের দিকে তাকাতে নেই। চোখ বন্ধ করো, বলেই তার হ্যান্ডব্যাগ থেকে দুটো চকোলেট ধরিয়ে দিলেন।

বেশ অবাক হচ্ছিলাম! এতোগুলো লোকের মধ্যে তারা কিভাবে এ কর্মটি নিরলসভাবে করে যাচ্ছিলেন। তবে বুঝতে পেরেছিলাম ছেলেমেয়ে দুজনেই এই কাজে ছিলেন পটু।

পরে ইংল্যান্ডে পৌছানোর পর এয়ারপোর্টে তাদের সঙ্গে আবার দেখা হলো। দেখি ওই জোড়া দম্পতি মামা–মামির সঙ্গে দাড়িয়ে কথা বলছেন।

আমাকে দেখে তারা যেন আলাপের খেই হারিয়ে ফেললেন। মামার কাছ থেকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন মেয়েটি। তারপর নাক টিপে বললেন, ছেলেটি খুব দুষ্টু।

দুষ্টু কি আমি, না আপনারা? এ কথা বলতেই অবস্থা বেগতিক মনে করলো দম্পতি। তড়িঘড়ি করে কাজ আছে বলে সোজা হেটে চলে গেলেন।

বিমান চড়ার প্রথম অভিজ্ঞতায় এ ধরনের একটি ঘটনা জড়িয়ে আছে ভাবতে বেশ হাসি পায়।

পুনশ্চ : সেদিন ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া অর্থনীতি বিভাগের এক বান্ধবীর এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। বান্ধবী সুন্দরী। তার বর আমেরিকায় ব্যবসা করে। সেখানেই থাকে।

বিয়ের পর সেও আমেরিকায় যাবে। বান্ধবীর স্বপ্ন বিমানে চড়ার। সেদিন অনুষ্ঠানে এ ব্যাপারে কথা উঠতেই সেই কাহিনীটি শুনিয়ে দিলাম। আর যায় কোথায়! কথা শুনে বান্ধবীসহ আশপাশের মেয়েরা লজ্জায় লাল। ফর্শা অবয়বের বর্ণ বিবর্ণ হওয়া দেখে বুঝতে পারছিলাম অবস্থা কি! রসিকতা করে তাদের সবাইকে সাবধান করলাম। বললাম, সেবার ছোট ছিলাম বলে ওই নবদম্পতিকে কিছু বুঝতে দিইনি। কিন্তু তাই বলে তোমরা কেউ উত্তেজিত হয়ে আবার এমন কাণ্ড করো না। তাহলে কিন্তু দুর্গতি আছে কপালে। যে কোনো সময় যাত্রীরা সোজা বিমান থেকে ভূমধ্যসাগরে নামিয়ে দেবে। কথা শুনে মেয়েগুলো যেন পালাতে ব্যস্ত হলো।

নতুন দম্পতিদের জন্যও একই পরামর্শ।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে

টয়লেট ও পান

মুহাম্মদ জলিল উদ্দিন রইছ

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার পর শুরু হলো ধরপাকড়। তখন রাজনীতি করতাম, এখনো করি না। এক মিথ্যা হত্যা মামলায় আমাকে জড়ানো হয়েছিল। তা থেকে বাচার একমাত্র পথ ছিল বিদেশ যাওয়া। পনেরো দিনের মধ্যেই যাওয়ার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। ১৫ সেপ্টেম্বর ফ্লাইট। তার আগেই কিছু আরবি ও ইংরেজি শিখলাম।

ফ্লাইটের সময় হয়ে গেছে, ওই সময় কিছু বুঝতাম না। প্লেন ছিল সউদি এয়ারলাইন্স। প্লেনে ঢোকার সময় সউদি এয়ারহস্টেসরা বলতে লাগলো, আহলান ওয়া সাহলান।

তখন বুঝতাম না। এখন বুঝি, এর অর্থ আগমন ও স্বাগতম।

আমি ইংরেজিতে বললাম, হাউ আর ইউ।

সিট নাম্বার দেখে সিটে বসিয়ে দিল। আসার সময় সিগারেটের প্যাকেটটা রেখে দিয়েছে সউদি কর্তৃপক্ষ। আমার পাশে এক ভদ্রলোক সউদিতে অনেকদিন ধরে আছেন। আমাকে বললেন, আপনি কি নতুন?

বললাম, জি।

তিনি বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি পুরনো।

এ কথা বলেই তিনি সিগারেট ধরালেন।

আমি বললাম,ভাই এক টান দিয়েন।

ভদ্রলোক সিগারেট ধরানোর সঙ্গে সঙ্গেই প্লেনের ভেতর দায়িত্বশীল এক লোক এসে সিগারেট কেড়ে নিয়ে বললেন, স্টপ ইট, নো স্মোকিং।

লোকটি লজ্জা পেল। প্লেন ছাড়ার সময় হলো। ছাড়ার আগে আরবি ভাষায় একটি দোয়া পড়া হলো। আমার কাছে এতো ভালো লাগলো, মনে হতো প্রতিদিন যেন প্লেনে উঠি আর দোয়াটি শুনি।

প্লেন উড়াল দেয়ার পর ইংরেজি ও আরবি পত্রিকা দেয়া শুরু হলো। সঙ্গে সফট ড্রিংক। আমার পাশে সফট ড্রিংক নিয়ে আসার সময় এয়ারহস্টেসরা বললো, হোয়াট ডু ইউ লাইক।

বললাম, হুইস্কি।

এ কথা শুনে তারা হাসতে লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, নো সরি, আই ওয়ান্ট কোক।

প্লেন উড়তে লাগলো। জানালার পাশে চেয়ে দেখি নিচের বাড়িঘর যেন পাখির মতো। প্লেনের ভেতরের বাতি নিভিয়ে দিল কিছুক্ষণ রেস্ট নেয়ার জন্য। দুই ঘণ্টা পর দুপুরের খাবার দেয়া শুরু হলো। রুটির সঙ্গে খাসির মাংস, ব্রেড, ফ্রুট সালাদ ইত্যাদি। হালাল হওয়ায় আমি সব খাবারই খেলাম। ভালোও লাগছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার চা, কফি দেয়া শুরু হলো।

খাওয়া-দাওয়া পর্ব সেরে যারা সিগারেট টানবেন তাদের জন্য পেছনের সিটগুলো বরাদ্দ করা হলো। পেছনের দিকে চেয়ে দেখলাম, এমন অবস্থা যেন ধূপবাতি জ্বালানো হয়েছে বা আগুন লেগেছে। যাত্রীরা যেমন সিগারেট টানছে, তাদের সঙ্গে এয়ারহস্টেসরাও। ছয় ঘণ্টা লাগবে যেতে। বসতে বসতে আর ভালো লাগে না। ভাবলাম একটু হাটি।

হাটতে হাটতে চলে গেলাম এয়ারহস্টেসদের কাছে। তারা আমাকে দেখে বললো, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট।

উত্তর দিলাম, চকোলেট।

আমাকে তারা প্রায় দশ পনেরোটা চকোলেট দিল। এদিকে প্রজেক্টরের মাধ্যমে পর্দায় আরবি গান দেখানো হচ্ছে মুভির, কে বোঝে তাদের কথা? তবুও হা করে চেয়ে থাকতে হয়।

আরবিতে গান গায়, আনা হুব্বাক হাবিবি, ইনতা আনা অর্থাৎ আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি আমার।

জেদ্দার কাছাকাছি পৌছে গেছি, ভাবলাম টয়লেটে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নিই। টয়লেটে ঢুকলাম। সেখানে কি রাজকীয় অবস্থা! টয়লেট টিস্যু, ফেশিয়াল টিস্যু, হ্যান্ডক্রম, আফটার শেভ, টুথপেস্ট, টুথব্রাশও আছে। মহিলাদের জন্য বিশেষ প্যাডও রয়েছে।

তবে টয়লেটের অবস্থা বারোটা বাজিয়ে দেয়া হয়েছে। টয়লেট টিস্যু এদিক-ওদিক ফেলে রাখা হয়েছে। কমোডের পানি ফ্লাশ করেনি। বেসিনের পানি ছেড়ে চলে গেছে। কেউ কেউ আবার ব্রাশগুলো সঙ্গে নিয়ে গেছে।

মনে বড় কষ্ট পেলাম, আমাদের শিক্ষার অভাবে আজ এ অবস্থা। প্রায় পৌনে সাত ঘণ্টা পর জেদ্দা পৌছলাম।

দুই.

সাড়ে তিন বছর পর দেশে যাওয়ার ইচ্ছা খুবই প্রবল ছিল। ছুটিও পেয়েছিলাম চার মাস। আমার মিথ্যা মামলাটি তখনো চলছিল। এখন অবশ্য মুক্তি পেয়েছি। বাবা-মা, ভাই-বোন,

আত্মীয়স্বজন সবাই অনেক বুঝাতে চেষ্টা করলো না আসার জন্য। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলাম আসবোই, যা হওয়ার হবে। আল্লাহ ভরসা।

নিজ দেশে নিজ ইচ্ছায় যাবো বলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের টিকেট করলাম। বিমানে ঢুকতেই এয়ারহস্টেসরা আমাদের রিসিভ করছেন আর বলছেন আসসালামু আলাইকুম।

সালামের উত্তর দিলাম।

আমার সিট নাম্বারে গিয়ে দেখি অন্যজন বসা। বললাম, ভাই, এটা তো আমার সিট।

সে বললো, *আরে বইয়া থাকেন, যে সিটগুন আপনার ভালা লাগের ইডাতওই বইয়া যাউক গিয়া।*

আমাদের আলাপ দেখে এক এয়ারহস্টেস এসে বললেন, কি হয়েছে।

ঘটনা বললাম।

তিনি বললেন, আপনার যেখানে খুশি বসে যান।

তখন একটা উত্তর দিয়েছিলাম, ও বুঝতে পেরেছি গাই আর ষাড়ের বুঝি এক অবস্থা।

বসে পড়লাম। প্রজেক্টরে দেখানো হচ্ছে বিমানের ভেতর বসা, খাওয়া, টয়লেট, অক্সিজেন বন্ধ হলে কি করতে হবে।

আগের মতোই বাংলা পেপার এলো। বিমানের ক্যাটালগ দিগন্তও রয়েছে। বাংলাদেশি বিভিন্ন মাছ দেখে মনটা খা খা করছিল। আহারে কতোদিন তাজা ছোট মাছ খাই না।

এসব দেখে জিভে পানি এসে গেল। সব প্লেনেই সাধারণত ধূমপান নিষেধ। এক লোক সিগারেট ধরালো। কিন্তু এয়ারহস্টেসরা খুজে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটি ধরা পড়ে গেল। ধরা পড়ে যাওয়ায় কি অবস্থা।

এয়ারহস্টেসরা বললো, আপনাদের লজ্জা করে না। বলা হয়েছে সিগারেট না টানার জন্য। আপনি টানলেন কেন?

সে ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। প্রায় সাত ঘণ্টা পর ঢাকা এসে পৌছলাম।

তিন.

দেশ থেকে যাওয়ার সময় মনটা স্বাভাবিকভাবেই খারাপ থাকে। তাই কে কি করলো বিমানের ভেতর মনে রাখি না। প্রায় যাত্রীই বেশি কথাবার্তা বলে না।

চার.

চতুর্থবারও বিমানে এলাম। বিমানে উঠে শুনি বিমানটি শাহ আমানত এয়ারপোর্ট হয়ে ঢাকা যাবে। ওইদিকে বাড়ির লোকদের বলে দিয়েছি, নির্দিষ্ট সময়ে ঢাকায় আসার জন্য। তারপরও ভয় পেলাম না। ছুটিতে আসার আগে দুই তিনদিন খাওয়া যায় না, ঘুমানো যায় না, বিমানে উঠলে খুব ক্ষুধা লাগে।

আমাকে একবার খাবার দিল কিন্তু চিন্তা করে দেখলাম একবার খেয়ে পোষাবে না। যিনি খাবার পরিচালনা করেন তার নাম ছিল নাসরিন, আমি ছোট একটি কাগজে লিখলাম, *ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, প্লিজ গিভ মি এনাদার ডিশ।*

আমার চিঠি পেয়ে হাসিমুখে আরেকটি খাবারের টিফিন এনে দিলেন।

পাশে বসা এক যাত্রী আমাকে বললেন, জলিলভাই তিনি আপনার কি হন?

মিথ্যা কথা বললাম, আমার খালাতো বোন।

লোকটি উত্তর দিল বুঝেছি, মুখ চিনে মুগের ডাল।

খাওয়া–দাওয়ার পর এক যাত্রী পান খেয়ে পানের পিক বিমানের কার্পেটে ফেলে দিল। এয়ারহস্টেস বললেন, আপনি এটা কি করলেন!

যাত্রী উত্তর দিল, সউদি আরবে ইতা কার্পেটে আমরা মুতিও না অর্থাৎ প্রস্রাবও করি না।

এদিকে প্রজেক্টরে মাঝে মধ্যে বাংলা নাটক, মুভি, গান দেখানো হচ্ছে। ভাবলাম একটু ঘুরে আসি, ভেতরে দেখি বিদেশি কোনো যাত্রী আছে কি না। বিমানের ভেতরে ঘুরে কোনো বিদেশি যাত্রী আমার চোখে পড়লো না।

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে আকাশ ভ্রমণ করার অনেক সুযোগ হয়েছে। তবে যতোটুকু আনন্দ অন্য এয়ারলাইন্সে উড়ে পাই, ততোটুকু আনন্দ বাংলাদেশ বিমানে পাই না। তবুও সব সময়ই চেষ্টা করি আকাশ ভ্রমণে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে ওড়ার।

অনন্তপুর, হবিগঞ্জ থেকে

টেক অফ

আসিফ তৌহিদ

দেশ ভ্রমণের নেশা চেপেছিল সেই ছোটবেলায়। বাবার হাত ধরে একুশের বইমেলায় গুটি গুটি পথচলা আর আঙুলের ওপর ভর করে টেবিলের ওপর রাখা বইগুলোর নাম পড়ার চেষ্টা। লক্ষ্য একটাই, ভ্রমণ কাহিনী। নিঃশব্দ দুপুরগুলোয় আকাশ জুড়ে ক্লান্ত চিলের ওড়াউড়ি, জানালা ভেঙে আসা রোদে পা মেলে বিছানায় চিৎ হয়ে অজানা দেশের অচেনা পথগুলো অনেক দিনের চেনা করে নেয়া। *পাইলট হবো* – আঠারো বছরের স্বপ্ন ছিল।

বয়স বেড়ে যখন তেরো, একবার সুযোগ এলো। বাবা যাবেন ইনডিয়া। ধরলাম খুব করে, সঙ্গে যাবো লাগেজ হয়ে। দেখবো ছোট ছোট মানুষ, বাড়ি, নদী, রোড, বৃজ আরো কতো কিছু। বিধি বাম, বাবার সাফ কথা, বড় হয়ে নিজের যোগ্যতায় যাও। কি আর করা, দুঃখ বুকে চেপে চোখের পানি আটকে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা।

সুযোগ মিললো সহসাই। বাংলাদেশ স্কাউটসের একটা টিম যাবে সিঙ্গাপুর। তবে বড় কঠিন ঠাঁই, টিম সিলেকশন হবে সারা দেশ থেকে। ভাবলাম, দিই না নাম। বড়জোর ফেলই তো করবো। তারপর আবার গুটি গুটি পায়ে মায়ের কাছে। অনুমতিপত্র সাইন করাতে হবে। ঘণ্টা পাচেকের ঘ্যানঘ্যানানিতে বিরক্ত মা সাইন করলেন এই আশায় যে, ফেল করবো।

আমাকে আর কে পায়, এক দৌড়ে স্কুল, স্কাউট লিডারের কাছে জমা। স্কুলের ইন্টারভিউ, মেট্রপলিটান স্কাউটসের ইন্টারভিউ, তারপর রিজিওন আর সবশেষে ন্যাশনাল ইন্টারভিউ। প্রথম স্থান সব জায়গাতেই। উৎসাহ বেশি ছিল বলেই বোধহয়। অর্ডার ইসু হলো। কিন্তু গভীর গণ্ডগোল তখন বাড়িতে। না–না–না, একযোগে সব না।

দাদার বিশাল সাধু ভাষার চিঠি চিটাগাং থেকে, *ছাওয়াল এইক্ষণে ডাঙ্গর হইয়া উঠে নাই। উহাকে এতো অল্প বয়সে বিদেশে যাইবার অনুমতি কদাপি দেওয়া উচিত হইবে না।*

চাচাদেরও একই বক্তব্য। সরকারি চাকুরে বাবার সামর্থ সীমিত সত্ত্বেও বাবা আমার একটি কথায় সব মেনে নিলেন।

আমি যোগ্যতার পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি। এখন তুমি দেবে না কেন?

মা তো কাদতে কাদতে বিছানায়। সমস্ত টানাপড়েন আর নাটকীয়তার শেষে জিত আমারই।

তারপর নির্ধারিত দিনে চেপে বসলাম থাই এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে। যা-ই দেখি, তাতেই মুগ্ধ। কি নরম সিট, কি বিশাল বিমান, ধবধবে শাদা ডানা, বিশাল এঞ্জিন। সবচেয়ে ছোটখাটো বলে এয়ারহস্টেসদের বিশেষ খাতির, অতিরিক্ত খাবার। এক সময় অপেক্ষার পালা শেষ হলো। চাকা গড়াতে শুরু করলো। টারমাকের ওয়েটিং, পেটের ভেতর চঞ্চল প্রজাপতি।

হঠাৎ এঞ্জিনের পাওয়ার বুস্টআপ আর পেছন দিকে সিটের মধ্যে দেবে যাওয়া। দ্রুত পেছনে ছুটে যাওয়া গাছের সারি, আস্তে আস্তে বিমানের সামনের দিক উচু হয়ে ওঠা। হঠাৎ আলতো করে মাটির স্পর্শ ত্যাগ আর বিমানের দ্রুত উথান। পেছনে পড়ে থাকে টারমাক, জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, ক্যান্টনমেন্ট, গুলশান, সংসদ ভবন, ঢাকা শহর।

বায়ুর চাপ কমে যাওয়ায় বন্ধ কানের পর্দা, ধুকধুক করা বুক যেন দেশ ছাড়ার বেদনার প্রতিচিহ্ন। তারপর হঠাৎ একটা-দুটো মেঘের পাশ কাটানো। অগ্রবর্তী মেঘের পথ ধরে আসে আরো ঘন মেঘের সারি। ঘন কুয়াশার মতো ধোয়াটে অন্ধকার আর বিমানের হঠাৎ কেপে ওঠা। আবার হঠাৎ করে সব উধাও। ঝকঝকে রোদ ঢোকে দুই পরত কাচের মধ্য দিয়ে। কনকনে এসির মধ্যে শরীর ঘেমে ওঠে রোদের তাপে।

নিচে তখন পৃথিবী। আকাশ ঝকঝকে নীল। ধীরে ধীরে উথানের বাক কমে আসে। প্লেন স্থির হয় পয়ত্রিশ হাজার ফিট উচ্চতায়। টিভি স্কৃনে দেখায় আমরা পার হয়ে গেছি চট্টগ্রাম, ঢুকে পড়েছি পাশের দেশ মিয়ানমারে। ছোট ট্রলিতে করে আবার খাবার আসে উষ্ণ হাসিতে উদ্ভাসিত এয়ারহস্টেসের হাত ধরে।

বললাম, ককপিটে যাবো।

অনুমতি মিললো ক্যাপ্টেনের। প্রায় লেফট রাইট করে গিয়ে ঢুকলাম, ঢুকেই এক পেল্লায় স্যালিউট। কি ভেবে দিয়েছিলাম তা মনে নেই। তবে ক্যাপ্টেন বেজায় খুশি। তিনিও ছোটবেলায় স্কাউট ছিলেন হয়তো। মনে পড়েছিল সেই অনাবিল হাসির দিনগুলো।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে বুঝিয়ে দিলেন বিমান কি করে চালান। যাবার সময় হাতে তুলে দিলেন একটা মডেল বিমান। আমার সঙ্গের বাকিরা ঈর্ষায় প্রায় সবুজ।

গল্প-গুজবের মাঝেই জ্বলে ওঠে সিটবেল্ট বাধার নির্দেশ। ব্যাংকক সন্নিকটে। সেখানে বিমান বদল হবে। নিভে গেল সব আলো, কেবল আবছা দুই-একটা আলো বাদে। ধীরে ধীরে মেঘের চাদর ছিন্ন করে নিচে নামা। এয়ারপকেটে পড়ে হঠাৎ ঝাকুনি আর ধপ করে নিচে পড়ে যাওয়া।

দূরে ব্যাংকক শহরের আলো। লাল টালির বাড়িঘর। নিচে, নিচে আরো নিচে, মনে হয় ছুয়ে যাবো ছাদগুলো। নৈকট্যের কারণে দ্রুত হয় সব কিছু। হঠাৎ শুরু হয় রানওয়ে আর তার ওপর ভেসে চলা কিছুক্ষণ।

চাকার স্পর্শ রানওয়েতে, ঝাকিতে কেপে ওঠা বিমান। এঞ্জিনের উল্টো ধাক্কা, সিট থেকে সামনে ঝুকে পড়া। হঠাৎ উপলব্ধি, আমি এখন বিদেশের মাটিতে, দেশ, চেনা পরিজন থেকে বহু দূরে। বাক নিয়ে প্লেনের নির্দিষ্ট টারমিনালে যাওয়া। চারপাশের আরো অনেক প্লেনের, অনেক আলো,

অনেক গাড়ি সবই মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখা। ঘাড় উচু করে দূর দেয়ালের ওপাশে থাইল্যান্ড দেশটাকে দেখার চেষ্টা। সব কিছু ছাপিয়ে হঠাৎ মনে হওয়া, দূর, এতো দ্রুত সবশেষ হয়ে গেল!

সময়ের সঙ্গে প্লেনে চড়ার মাত্রাও বেড়েছে। তবু প্রতিবার টেক অফ আর ল্যান্ডিংয়ে মনে পড়ে সেই প্রথমবারের বুক ধুকপুক করা স্মৃতি।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

খেলা

মিল্টন রোজারিও

আসুন, আমরা আকাশ পথে ভ্রমণ ভ্রমণ খেলি। প্রয়োজন মাত্র দুটি ছোট কিংবা বড় মাপের কাগজ। প্রথম কাগজ নিয়ে ওপর-নিচে চার পাচটা ভাজ দিন। দেখবেন, প্লেনসদৃশ কাগজের আকার হয়ে গেছে। তারপর আকাশে ছুড়ে দিন। কিছুক্ষণের জন্য হলেও বাতাসে ভেসে বেড়াবে।

দ্বিতীয় কাগজটি শুধু ভাজ নয়, নিচের অংশ সামান্য কেটে প্লেনের জন্য লেজ বানাতে হবে। আকাশ ভ্রমণের জন্য এ প্লেনটা খারাপ হবে না।

ছোটবেলায় এই দুই ধরনের প্লেন বানানো শিখেছিলাম। এখন আমার প্রিয় ছোট দুই ভাগ্নেকে এভাবে প্লেন বানিয়ে হাতে দিই। তারা উৎসাহ নিয়ে শূন্যে ছুড়ে হাততালি দেয়। মজা পায় তারা।

এই হলো আমার আকাশ ভ্রমণ খেলা। অনেক অভিমান-অনুযোগ-অনুরাগ নিয়ে কাগজে করে আকাশ পথে পাড়ি দেয়ার গল্প বললাম। ভুল হলে মাফ করবেন।

যায়যায়দিন বিশেষ সংখ্যার বিশেষ বিষয়টা কারা নির্বাচন করেন আমরা পাঠকরা কি তা জানার অধিকার রাখি? যেখানে বাংলার আশি-নব্বই ভাগ মানুষের উড়ন্ত প্লেন ছাড়া সামনাসামনি দেখার সৌভাগ্য হয় না সপ্তাহে এক থেকে দুবার সেখানে আকাশ পথে ভ্রমণ! কি, ঠাট্টা করছেন? করতেই পারেন। সবাই যখন করছে আপনারা বাদ যাবেন কেন?

সম্পাদকীয়তে লেখেন, বিদেশ থেকে এবারো আমরা প্রচুর লেখা পেয়েছি। এবার লিখবেন বিশেষ সংখ্যা যারা বিদেশে গেছেন, এসেছেন প্লেনে বা আকাশ পথে শুধু তাদের জন্য। আপনারা আমাদের ভুল বুঝবেন না। কেননা এ শর্তটা আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

ভালোবাসা, বাবা, মা, শাড়ি-র মতো সর্বজনীন বিষয় যদি নির্বাচন করতে পারেন তবে অভিজ্ঞ আপনারা কেন আকাশ ভ্রমণের মতো সর্বজনীন নয় এমন বিষয় বেছে নিলেন? দয়া করে জানাবেন কি?

পূর্ব মহিষবাথান, রাজশাহী থেকে

যারা এখনো প্লেনে চড়েননি তাদের প্রতি আমাদের উপদেশ, যেভাবেই হোক টাকা জমিয়ে অন্তত একবার প্লেনে চড়ুন। রাইটস ভাতৃদ্বয় একশ বছর আগে যা করেছিলেন তা এখন পারবেন না কেন?-যাযাদি

অসুস্থ

সাতিয়া মুনতাহা নিশা

আমি তখন বেশ ছোট, সবে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছি। আব্বুর কর্মস্থল তখন দিনাজপুর। চিকিৎসার জন্য প্রায়ই ঢাকায় আসতে হতো। সময় বাচাতে অনেক সময়ই বাহন হিসেবে বেছে

নেয়া হতো প্লেনকে। তাই বলা চলে, ওই ছোট বয়সেই আমার আকাশপথে ভ্রমণ করার অভিজ্ঞতা হয়। এক দুবার নয়, বহুবার। সৈয়দপুর থেকে উঠতাম। প্লেনে চড়ে শান্তি মতো বসেন, একদণ্ড আরাম করতে না করতেই দেখতাম জিয়া এয়ারপোর্টে পৌছে গেছি।

অবাক লাগতো আবার ভালোও লাগতো। অবাক হতাম আকাশের রাস্তাটা এতো ছোট এই ভেবে! ভালো লাগতো আকাশের বুকে ভেসে বেড়ানো মেঘগুলো। মেঘগুলোকে মনে হতো তুলার মতো হাত দিয়ে ধরতে ইচ্ছা হতো। কখনো বা শাদা মেঘগুলোকে মনে হতো শাদা হাওয়াই মিঠাই। ফেরিওয়ালাকে দেখতাম কাচের বাক্সে গোলাপি রঙের হাওয়াই মিঠাই নিয়ে ফেরি করতে। আমার ভীষণ ইচ্ছা হতো অমন একটা কাচের বাক্সে মুঠো মুঠো মেঘ ধরে রাখতে। প্লেনের জানালাগুলো খুলতে পারতাম না বলে খুব রাগ হতো। মনে হতো সব দোষ ওই পাইলটের। পাইলটের মাথার চুল টেনে ছেড়ার এক অদম্য ক্ষোভ নিয়ে বসে থাকতাম সিটে।

একবার ঢাকায় আসবো। তার আগের দিন গেলাম চিরির বন্দর উপজেলার কৃষি মেলা দেখতে। সেখানে আমাদের আপ্যায়ন শেষে পান দেয়া হলো। কিন্তু পানটা খাবার পর পরই আমার গা গুলিয়ে যেতে লাগলো।

যাহোক, পরদিন ভোরে ফ্লাইট সকাল সকাল সৈয়দপুর রওনা দিতে হবে। তাই ব্যস্ততা আর উত্তেজনায় রাতে তেমন অস্বস্তি টের পেলাম না।

ভোরে সৈয়দপুর গেলাম। আনুষঙ্গিক কাজ সেরে বিমানে উঠে বসলাম। একটু পরই প্লেন চলতে শুরু করলো। রানওয়ে ছেড়ে একটু ঝাকি খেয়ে প্লেনটা যেই আকাশে উড়াল দিল অমনি আমার গা গুলানো ভাবটা ফিরে এলো। খুব খারাপ লাগতে থাকায় সিটে মাথা রেখে গা এলিয়ে দিলাম। চোখ বুজে মরার মতো পড়ে রইলাম যা কি না আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। এর মধ্যে এক এয়ারহস্টেস এলেন, ট্রেতে কমলা আর আনারসের জুস। অন্যদিন হলে এয়ারহোস্টেসদের দেখে হা করে তাকিয়ে থাকতাম। কিন্তু তখন তাকে দেখে আমার খুবই বিরক্ত লাগলো।

আম্মু কমলার জুস খেতে বললেন।

কয়েক চুমুক খেয়ে রেখে দিলাম। আগের চেয়ে কিছুটা ভালো লাগলো। ঢাকায় প্রায় পৌছে গেছি এমন সময় সাহস করে চোখ খুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। এরপর যে কি হলো বুঝতেও পারলাম না। আবছাভাবে শুনতে পেলাম, প্লেন কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যান্ড করবে আর আমাদের সিটবেল্ট বেধে নিতে বলা হচ্ছে।

মা সিটবেল্ট বেধে দিলেন কি না তাও মনে নেই। শুধু মনে আছে ল্যান্ড করার আগে প্লেনটা একটু ঝাকি খেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হড়হড় করে বমি করে দিলাম।

মা সিটের পকেট থেকে প্যাকেটও বের করার সময় পেলেন না। আমি বমি করে সব ভাসিয়ে দিলাম।

সে বছর প্লেনে চড়ে এতোটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম যে, আজো সেই আকাশ ভ্রমণের কথা ভুলতে পারিনি।

ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা থেকে

বিষণ্ণতার অবসান

শাহাবুদ্দিন আহমেদ শুভ

আম্মুর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না ইদানীং। প্রায় সময়ই আনমনা হয়ে বসে থাকেন। জিজ্ঞাসা করি, এমন মন খারাপ করে বসে থাকো কেন?

বলেন, তুই বুঝবি না।

আমি খুব চাপাচাপি করাতে বললেন, রুহেনা আর লিপিকে দেখলে ভালো হয়ে যাবো।

রুহেনা আমার বড় আপু এবং আপুর একমাত্র মেয়ে লিপি। চার বছর ধরে লন্ডনে দুলাভাই ফজলু মিয়াকে নিয়ে আপুর ছোট্ট সংসার।

আমার কাছ থেকে আম্মুর কথা শুনে আপু সিদ্ধান্ত নিলেন দেশে আসবেন। তবে দুলাভাই আসতে পারবেন না। কারণ তিনি এলেও এক সপ্তাহের বেশি থাকতে পারবেন না।

আপু আসছেন শুনে আম্মু যেন পচিশ ভাগ ভালো হয়ে গেলেন। আত্মীয়স্বজন সবার মাঝেই আনন্দ। কারণ দীর্ঘ দিন পর আপু দেশে আসছেন। আপার ফ্লাইট শেডিউল ছিল লন্ডন–দুবাই–ঢাকা–সিলেট বাংলাদেশ বিমানে। সকাল সাতটা পচিশ মিনিটে সিলেট এমএজি ওসমানী এয়ারপোর্টে এয়ারবাসটির ল্যান্ড করার কথা। দুলাভাই আমাকে এ শেডিউল জানিয়ে দিয়েছিলেন আগেই। আমি, আমার ছোটভাই শামসুদ্দিন, আম্মু, খালাম্মা ও ছোট দুলাভাই সকাল সাতটায় এয়ারপোর্টে পৌছালাম।

সকাল আটটা হয়ে গেল অথচ বিমান আসছে না। কি ব্যাপার জানার জন্য বিমান অনুসন্ধানে গেলাম। কিন্তু কোনো সঠিক উত্তর পেলাম না।

ঘড়ির কাটা ধীরে ধীরে নয়টা অতিক্রম করলো। লন্ডন থেকে ছেড়ে আসা এয়ারবাসটি সিলেটের আকাশে দেখা যাচ্ছে না। এয়ারপোর্টে অবস্থানরত যাত্রীদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে উৎকণ্ঠা।

লন্ডন থেকে দুলাভাই বার বার আমাদের বাসায় ফোন করে জানার চেষ্টা করছেন আপা পৌছেছেন কি না। কারণ লিপিকে নিয়ে তিনি এই প্রথম একা বাংলাদেশে আসছেন।

এয়ারপোর্টের ঘড়ির কাটা তখন দশটা অতিক্রম করলো অথচ অনুসন্ধানে জানা গেল এয়ারবাসটি এখনো বাংলাদেশে প্রবেশ করেনি। এ কথা শোনার পর আম্মু কান্না শুরু করে দিলেন আর বললেন, আমার জন্যই আজ তাদের এ দশা। কোনো কিছু হলে আমি জামাইকে (আমার দুলাভাই) কি উত্তর দেবো।

খালাম্মা অনেক কষ্টে আম্মুকে সামাল দিলেন।

দেরি হওয়ার কারণ হলো, বিমান দুবাই এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার আগে এক ভদ্রলোক বিমানের টয়লেটে গিয়েছিলেন অথচ বের হয়ে আসতে পারছিলেন না। কারণ এয়ারবাসটি ছিল বেশ পুরনো। তাই বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজা অনেক চেষ্টা করেও খোলা যায়নি। অবশেষে দুবাই এয়ারপোর্টে নেমে দরজা খুলে ভদ্রলোক বের করা হয়। না জানি বিমান ল্যান্ড করার সময় তার কতো কষ্ট হয়েছে। হার্টের রোগী হলে হয়তো বা স্ট্রোক হতো তার। বিধাতা সহায় ছিলেন বলে কিছুই হয়নি।

বিকাল চারটায় বিমান ঢাকায় নামতে পারেনি বেশ কয়েক চক্কর দিয়েও। কারণ ঢাকার আবহাওয়া ভালো ছিল না। বিমান ইতিমধ্যে প্রায় আট ঘণ্টা দেরি হওয়ায় যে পরিমাণ খাবার ছিল তাও শেষ হয়ে গিয়েছিল। শিশুদের কোনোভাবেই তাদের মা–বাবা সামলাতে পারছিলেন না। কারণ তারা দীর্ঘ সময় একই জায়গায় বসে আছেন। কি যে পরিস্থিতি তা না দেখলে বোঝা

যাবে না। অবশেষে বিমানটি ঢাকায় ল্যান্ড না করে চট্টগ্রামের পথে পাড়ি জমায় এবং চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে।

চট্টগ্রামে নামার পর বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। বিমানের ইঞ্জিনিয়াররা চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ায় ঢাকা থেকে ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে বিমান ঠিক করা হয়। অথচ এই সময়ের মধ্যে যাত্রীদের হোটেলে নেয়া হয়নি, বিমানে বসিয়ে রাখা হয়।

রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় বিমান ঢাকায় পৌছে। ঢাকা থেকে সিলেটে আসার প্রস্তুতি নেয়া হয়। এদিকে এয়ারপোর্টে আগত যাত্রীদের আত্মীয়স্বজন এবং যে যাত্রীরা সেই বিমানে দেশের বাইরে যাবেন তারা সবাই বার বার ওসমানী এয়ারপোর্টের ম্যানেজারের রুমের দিকে যেতে চাচ্ছেন। কিন্তু নিরাপত্তা কর্মীরা বাধা দিল।

অবশেষে সবাই যখন পৌছালাম তখন ম্যানেজার তার রুমে নেই, তিনি নাকি চলে গিয়েছেন। এ কথা শোনার পর সবার মাঝে একটা বিদ্রোহী ভাব দেখা দিল। অনেকে ভাবছিলেন কিছুটা ভাংচুর করার কথা । এমন সময় মাইকে ঘোষণা দিল, বিমান কিছুক্ষণের মধ্যে সিলেট ওসমানী এয়ারপোর্টে নামবে।

তখন রাত সাড়ে এগারোটা।

আপা যখন আমাদের মাঝে এলেন, আমরা ভুলে গেলাম সারা দিনের ক্লান্তি।

এতো জার্নি ও বিলম্বিত ফ্লাইটে এসেও আমাদের দেখার পর আপার সব ক্লান্তি দূরে চলে গেল।

আমাদের মাঝে সে কি আনন্দ!

shahabuddin_hmd@yahoo.com
সিলেট থেকে

স্ট্যান্ডার্ড

এমএ মুকিত

প্রতি বছরই স্প্রিং ভ্যাকেশন শেষে যখন দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়, মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। ভ্যাকেশনের শুরুতে নারিতা–ঢাকা ফ্লাইটটা ঠিক যতোটা আনন্দের, ফিরতি ঢাকা–নারিতা ফ্লাইটটা ঠিক ততোটাই বিরক্তির। এই আনন্দ আর বিরক্তির মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে আমাকে বছরে মোটামুটি একবার, আকাশপথে।

বিমানে ভ্রমণ আমার কখনোই ভালো লাগেনি। বাইরে তাকালে শুধু শাদা মেঘ, এতো বৈচিত্রহীন আর ভেতরে খুব ছোট্ট একটা এলাকার ভেতর নিজেকে গুটিয়ে রাখা। কি করবো? ইকনমি ক্লাসই যে আমার ভরসা। প্রত্যেকবারের মতো ২০০০ সালের মার্চ মাসেও স্প্রিং ভ্যাকেশন শেষে ঢাকা থেকে নারিতার ফ্লাইট ধরলাম। এবেনের গল্পটা সেই সময়কার।

এবেনের সঙ্গে আমার দেখা হয় প্লেনে। আমার পাশের সিটের সহযাত্রী ছিল সে। মাঝখানের সারির আইনের দিকটার সিটটা আমার, এবেন মাঝখানে। আমাদের সিটের সামনেই গ্যালের দেয়াল, দেয়ালে বড় একটা স্ক্রন। ভাবলাম, ভালোই হলো। সিনেমা দেখে দেখে ঢাকা–কুয়ালা লামপুর ফ্লাইটের চার পাচ ঘণ্টা কেটে যাবে। পাশে বসা এবেনকে একনজর লক্ষ্য করে ডুবে গেলাম *মর্নিং পোস্ট* বা এই জাতীয় কোনো পত্রিকায়।

হঠাৎ কি যেন খটকা লেগে উঠলো। বুঝলাম, আমার পাশের যাত্রীটি অর্থাৎ এবেন, দেখতে ইওরোপিয়ান অথচ সে চোখের সামনে একটি বাংলা ম্যাগাজিন ধরে আছে। আশ্চর্য ব্যাপার? চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলাম, আসলেই তো বাংলা ম্যাগাজিন!

কিভাবে যেন একদৃষ্টে ম্যাগাজিনের দিকে তাকিয়ে থাকা এবেন আমার বিস্মিত দৃষ্টি টের পেল। সেও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। মুখে স্মিত হাসি। যেন আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে আমাকে অবাক করে দেবে এবং আমার বিস্মিত দৃষ্টি দেখে সে খুশি। কারণ তার পরিকল্পনা কাজ করেছে। এবেন ছেলেটি পচিশ বা ছাব্বিশ বছর বয়সী। আমেরিকান হোয়াইট, সোনালি চুলের ভদ্র ছিমছাম গোছের। চোখে বিল গেটস টাইপের চশমা, চুলের স্টাইলও অনেকটা সে রকমই। এ ধরনের চেহারা দেখলেই সবার আগে যে ইমপ্রেশন তৈরি হয় তা হলো বুদ্ধিমান ও সপ্রতিভ এবং আসলেই তাই।

সে আমাকে অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কি অবাক হচ্ছেন? আমি বেশ ভালো বাংলা বলতে পারি।

ঠিক করলাম, এর সঙ্গে সারাক্ষণ বাংলায় কথা বলবো। দেখি কতোক্ষণ টিকতে পারে! বললাম।

অবাক তো হলামই। খুব কম বিদেশিকেই বাংলা বলতে দেখেছি আর বলতে পারলেও আপনার মতো এতো ভালো বাংলা আমি কোনো বিদেশির মুখে শুনিনি।

তাই নাকি? আমার নয় মাসের কষ্ট কাজে লেগেছে। আমাকে অনেক বেশি অবাক করে দিয়ে এবেন বললো।

প্রায় চিৎকার করে উঠলাম আমি, মাত্র নয় মাস? তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে স্পেশাল কোর্স করেছো নাকি? এক মুহূর্তেই সমবয়সী এবেনকে তুমি করে বলার সাহস পেলাম।

নাহ! আমি এসেছি ঢাকার মগবাজারের এক ক্লিনিকে, নয় মাস আগে। তোমাদের দেশের মেডিকাল সিসটেম সম্পর্কে জানতে।

এবেনকে বেশ আলাপী মনে হলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, তা এতো সুন্দর বাংলা শিখলে কোথায়? তুমি তো দেখছি বাংলা পড়তেও পার!

ক্লিনিকে আমার এক ফ্রেন্ডের কাছে আর এখন অবসরে বাংলা পড়াটা আমার হবি। এবেন হেসে হেসে বললো।

ফ্রেন্ড? নিশ্চয়ই কোনো সুন্দরী নার্স বা ডাক্তার?

তাহলে তো হতোই। তবে তোমাদের দেশের মেয়েগুলো কিন্তু দারুণ সুন্দরী আর খুব মিষ্টি স্বভাবের।

বিশের দশকে দুজন তরুণ যাদের একজন ছুটি শেষে দেশ-পরিবার ছেড়ে এবং অন্যজন শখের একটি দেশ ছেড়ে বিষণ্ন মনে মালয়শিয়ান এয়ারের ফ্লাইটে উঠেছিল তাদের মধ্যে কথাবার্তা দারুণভাবে জমে গেল।

এবেনের সঙ্গে কথা হলো অনেক বিষয়ে। বাংলাদেশে তার থাকা নয় মাসের অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশ আর আমেরিকার মেডিকাল সিসটেমের তফাত, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, জাপানে ঘুরতে যাবার জন্য ভালো ভালো জায়গা ইত্যাদি।

কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, এবেন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির মেডিকাল স্কুলের ছাত্র। থাকে বস্টনে। মনে মনে বললাম, চেহারা দেখে যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। সম্ভবত আর কয়েক বছর পর (হয়তো এখনই। কারণ এবেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ছয় বছর আগে) এবেন হবে আমেরিকার সবচেয়ে এলিটদের একজন। তার চিন্তা-ভাবনাও অনেকটা সে রকম। তখন আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সবেমাত্র রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন পেয়েছিলেন (সুপার টিউসডে ধরনের কিছু একটা ইভেন্টে জন ম্যাককেইনকে হারিয়ে)।

এবেন সে সম্পর্কে উদ্বিগ্নভাবে বললো, জর্জ বুশের বাবাও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কাজেই একই পরিবার থেকে বংশানুক্রমে আরেকজন প্রেসিডেন্ট হবে, এটা ভালো লক্ষণ নয়।

ভাবলাম, তাদের চিন্তা-ভাবনা কতো পরিষ্কার!

কথা প্রসঙ্গে এবেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তুমি বাংলাদেশকে বেছে নিলে কেন? আর বাংলা ভাষাটাই বা এতো পছন্দ কেন তোমার?

এবেন বললো, বাংলাদেশকে স্টাডির জন্য বেছে নেয়ার পেছনে তেমন কোনো কারণ নেই। তোমার দেশ আর আমার দেশের মেডিকাল স্ট্যান্ডার্ডে অনেক তফাত আছে। সেই তফাতটা শেখার জন্যই আমার এখানে আসা। তবে বাংলা ভাষা শেখার পেছনে আমার একটা কারণ আছে।

তাই নাকি? হেসে বললাম, নিশ্চয়ই কোনো বাঙালি সুন্দরীর সঙ্গে বেশি বেশি কথা বলতে চাও বলে, তাই না?

এবেন হা হা করে হেসে উঠলো।

বললো, না সিরিয়াস কারণ। আমি বাংলাদেশে এসে যে জিনিসটা দেখে কষ্ট পেয়েছি সেটা হলো নার্সদের স্ট্যান্ডার্ড। তাদের আরো অনেক ভালোভাবে শেখানো যায়, অনেক বেশি দায়িত্ব দেয়া যায় এবং আরো বেশি সম্মানও দেয়া যায়। অথচ বাংলাদেশে সেটা নেই।

আমি আস্তে আস্তে মাথা নাড়িয়ে বললাম, ঠিকই বলেছো।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো – এবেনকে কিছুটা উত্তেজিত দেখালো।

দেশে নার্সদের জন্য কোনো ভালো বাংলা ম্যানুয়াল নেই। তারা শিখবে কোথা থেকে? এবেন বললো।

আমার আবার আশ্চর্য হবার পালা। বললাম, তুমি এতো কিছু ভেবেছ? আমি তো কোনোদিন এই ব্যাপারটা ভেবেও দেখিনি।

আরে, তুমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনের।

এবেনকে কিছুটা সান্ত্বনাসূচক শোনালো।

এবেন আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বললো, সে জন্য আমার স্বপ্ন হলো বাংলা ভাষায় একটা নার্সিং ম্যানুয়াল লিখবো। এটা পড়ে এ দেশের নার্সরা আরো অনেক দক্ষ হবে।

আশ্চর্য হয়ে ফ্যালফ্যাল করে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার দুই চোখে এক ধরনের আলো দেখতে পেলাম, সুন্দর স্বপ্ন লালন করলে মানুষের যেটা হয়।

এবেন থামছে না। বলেই চললো।

আরো বললো, আমি যখন খুব বড় বিখ্যাত ডাক্তার হবো তখন বাংলাদেশে ইআর–এর মতো জরুরি চিকিৎসার জন্য একটা অত্যাধুনিক হাসপাতাল করবো। এটা আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন।

এবেনের সঙ্গে আমার আরো অনেক কথা হয়েছিল। কিন্তু সবটা মনেও নেই। আমার শুধু ছেলেটাকে হিংসা হচ্ছিল। কি সুন্দর স্বপ্ন! বাংলায় একটা নার্সিং ম্যানুয়াল লিখবে। আর আমার কি স্বপ্ন? অনেক বড় ইঞ্জিনিয়ার হবো, অনেক প্রোগ্রামিং করবো। সবাই বলবে দক্ষ। প্রকৌশলী। অনেক বড় কম্পানিতে চাকরি করবো। অনেক বেতন হবে, বাড়ি হবে, গাড়ি হবে।

আরো কতো কি? অথচ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি কি তৈরি করবো তার ব্যাপারে আমার কোনো স্বপ্ন নেই। আমার সব স্বপ্ন আমি কি হবো, আমি কি পাব – তা নিয়ে। আমি কি করবো তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথাও নেই। স্বপ্ন তো দূরের কথা!

বাংলাদেশ আর আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থাই কি এর জন্য দায়ী? আমাদের দেশের ছেলেরা এসএসসি অথবা এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে বলে, কমপিউটার প্রকৌশলী হবো, ডাক্তার হবো ইত্যাদি ইত্যাদি।

কেউ বলতে পারে না সে কি করবে। পত্রিকার সাংবাদিকরাও জিজ্ঞাসা করেন, বড় হয়ে কি হতে চাও?

কেউ জিজ্ঞাসা করেন না, কি করতে চাও?

অথচ এবেনের সঙ্গে আমার ঘণ্টা দুয়েকের কথায় বুঝলাম হওয়াটা আসল নয়, করাটাই আসল।

প্রতি বছর এসএসসি বা এইচএসসির রেজাল্ট ঘোষণার পর অধীর আগ্রহে আমি পত্রিকা পড়ি। মনে মনে ভাবি এবার নিশ্চয়ই কোনো ছাত্র বা ছাত্রী বলবে, আমি সহজেই পানিকে আর্সেনিকমুক্ত করা যায় এমন কোনো যন্ত্র বানাতে চাই বা এ ধরনের কিছু।

আমার দুর্ভাগ্য যে, এ ধরনের কিছু পাই না।

বাংলাদেশ আর আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার স্টান্ডার্ডে কতো তফাৎ!

বাংলাদেশ আর আমেরিকার শিক্ষিত তরুণদের চিন্তার স্ট্যান্ডার্ডে কতো তফাৎ!

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন দরকার। এই ভেবেই এবেনের কথা লিখলাম। আমার দেশে এসে সে কি সুন্দর স্বপ্ন পেয়ে গেছে। হয়তো এখন সেই স্বপ্নকে লক্ষ্য করে সে অনেক দূর এগিয়েও গেছে আর আমরা স্বপ্ন দেখবো না! এটা হয় না।

কুয়ালা লামপুর এয়ারপোর্টে বিদায় নেবার পালা এবেনের সঙ্গে। জাপানে বেড়াতে আসার জন্য বললাম।

ফিরতে ফিরতে মনে হলো, ছেলেটার ফ্যামিলি নেম তো জানা হলো না। ভাবলাম, পরে আবার দেখা হলে জিজ্ঞাসা করবো। আবার হয়তো নতুনভাবে অবাক হবো।

জাপান থেকে
mukit_tohoku@yahoo.com

শাদা পাখি

মোমেনুল ইসলাম শিমুল

যখন ছোট ছিলাম তখন দূর নীল আকাশের বুক চিরে ছোট শাদা পাখির মতো ডানা মেলে প্রচণ্ড শব্দ করে বিমান যেতো, ঘর থেকে বের হয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম ওই শাদা শব্দ করা পাখিটির দিকে। এক সময় শাদা পাখিটা দূর আকাশে হারিয়ে যেতো। মনে মনে ভাবতাম যারা যাত্রী তারা কতোই না আনন্দ করছে, আকাশের বুক চিরে উড়ে বেড়াচ্ছে, দূর থেকে সুন্দর এ পৃথিবীটাকে দেখছে।

১০ জানুয়ারি ২০০৫-এ আমার সেই শাদা শব্দ করা পাখিতে চড়ার সময় এলো। আমার আনন্দ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আনন্দের বদলে হৃদয়টা ছিল দুঃখভারাক্রান্ত। কারণ বাবাকে নিয়ে সেদিন ঢাকা থেকে সিলেট আসি। বাবা লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত, গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। বাবা, মেজভাই, আমি, আমার বোন, এ চারজনের জন্য অনেক কষ্ট করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর চারটি টিকেট সংগ্রহ করা হলো। আমাদের বিমান ছাড়ার সময় ছিল সকাল এগারোটা বিশ মিনিটে। টান টান উত্তেজনা এবং বিমানে চড়ার আতংক সর্বোপরি বাবার রোগে কষ্ট সব মিলিয়ে একটি কেমন যেন অবস্থা।

সকাল আটটায় ঢাকার কারওয়ান বাজারের একটি ক্লিনিক থেকে বাবাকে রিলিজ করে ট্যাকসি নিয়ে এয়ারপোর্টে এসে হাজির হলাম। এয়ারপোর্টে আসতে আমাদের সময় লেগেছে প্রায় দেড় ঘণ্টা। কারণ প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যাম ছিল। পথে বাবার অবস্থা একবার খারাপ হয়। কোনো মতে এয়ারপোর্টে এসে হাজির হলাম।

বোর্ডিং পাস নিয়ে বসে আছি লাউঞ্জে। এগারোটা বিশ মিনিটে জানানো হয় বিমান ছাড়বে দুপুর বারোটায়। এদিকে লাউঞ্জে বিশাল টেলিভিশনে বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ের টেস্ট খেলা সরাসরি দেখাচ্ছে এবং বাংলাদেশ সেদিন জয়লাভ করেছে। আমার দেশের ম্যাচ জয়ের আনন্দ এবং শাদা পাখিতে চড়ার আনন্দে যোগ দিতে পারছি না বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে। বুঝতে পারছি বাবা ক্ষিধে ও রোগে কষ্ট পাচ্ছেন। তখনো আমরা চারজন কিছুই খাইনি। বারোটায় আবার জানানো হলো বিমান দেরিতে ছাড়বে। কখন ছাড়বে একটু পরে জানানো হবে।

বাবার কষ্ট দেখে বৃটেন প্রবাসী এক মহিলা সেখান থেকে আনা কিছু খাবার দিলেন। কিন্তু বাবা সেটা খেতে পারলেন না। এদিকে সিলেটে আত্মীয়স্বজন ওসমানী এয়ারপোর্টে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। বিকাল চারটায় সেই কাঙ্ক্ষিত সময় এলো। বাবাকে হুইলচেয়ারে করে বিমান পর্যন্ত নেয়ার জন্য আমি হুইল চেয়ারের অনুমতি আনি। কিন্তু বিমান অনেক দূরে থাকায় আমাদের চারজনকে একটি মাইক্রোবাসে বিমানের সিড়ি পর্যন্ত পৌছে দেয়া হয়। আমি জানালার পাশে। বাবা আমার এবং মেজভাইয়ের মাঝে সিটে বসেন। তখন মনে হলো আমি সেই দূর শাদা পাখির পেটের মধ্যে আছি।

শাদা পাখি যখন আকাশে তখন উড়লো মাইকে নানান সতর্কতামূলক কথা বলা হলো এবং এ কথার ওপর এয়ারহস্টেস আমাদের ইশারায় দেখিয়ে দিলেন। শাদা পাখি চলতে শুরু করলো। এক সময় আমাকে মেঘের উপরে আবিষ্কার করলাম।

মাইকে বলা হলো আমরা আধা ঘণ্টার মধ্যে সিলেট ওসমানী এয়ারপোর্টে নামবো এবং কতো ফিট উপর দিয়ে যাচ্ছি তাও বলা হলো।

মেঘের ফাকে সূর্যের খেলা দেখছি আর বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্ট অনুভব করছি। তখন মাইকে আবার ঘোষণা করা হলো অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা হযরত শাহ জালাল (রা.)-এর পুণ্যভূমিতে নামতে যাচ্ছি, আপনারা সিটবেল্ট ভালোভাবে বেধে নিন।

কখন যে পচিশ মিনিট কেটে গেছে খেয়ালই করিনি। পাখিটা সিলেটের মাটিতে পা রাখলো বিকাল চারটা পচিশ মিনিটে। পাখিটি রানওয়ের শেষ প্রান্ত থেকে নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে আসছিল। তখন জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম রানওয়ের শেষ প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে মুখ থুবড়ে অসহায়ের মতো পড়ে আছে আরো একটি শাদা পাখি। জীবনের প্রথম বিমানে ছিলাম মাত্র ত্রিশ মিনিট। কিন্তু আমার বিমান যাত্রা সকাল আটটা শুরু হয়ে শেষ হয় বিকাল চারটা পচিশ মিনিটে। সর্বমোট আট ঘণ্টা পচিশ মিনিট। একমাত্র কারণ বিমানের দেরি।

আমার জীবনের প্রথম বিমানে চড়া বাবাকে নিয়ে। যতোবার বিমানে চড়ি ততোবারই মনে হয় পাশের সিটে আমার অসুস্থ বাবা বসে আছেন, তখন বিমানে চড়ার আনন্দ ম্লান হয়ে যায়। প্রথম বিমানে চড়ার তিন মাস পর বাবাও মার পথ ধরে শাদা পাখির মতো দূর আকাশে হারিয়ে গেলেন।

সুনামগঞ্জ থেকে

বিশ্বসুন্দরী

ওয়াহিদ চৌধুরী বীরবল

গতবার থাই এয়ারওয়েজে ঢাকা থেকে ব্যাংকক যাচ্ছিলাম। প্লেনে উঠে সিটে বসার পর দেখতে পেলাম পাশের সিটের যাত্রী এক বিশ্বসুন্দরী মহিলা। প্রথমে আমার হার্টবিট বেড়ে গিয়েছিল। প্লেন আকাশে ওড়ার পর মহিলাটি পরিচয়পর্ব সেরে গল্প শুরু করে দিল। তখন নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিলাম। শুধু ওই বিশ্বসুন্দরীকে ঘিরেই আমার সব চিন্তা-চেতনা, স্বপ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তার প্রেমে পড়ে গিয়েছি।

এ সুযোগে মহিলাটি আমাকে তার স্বামীর পরিচয় দিয়ে ব্যাংককের হোটেলে একই রুমে থাকার আমন্ত্রণ জানায়। প্রথমে বিব্রত বোধ করলেও পরে রাজি হয়ে যাই। এরপর প্লেন থেকে নেমে সোজা হোটেলে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে একই রুমে রাত যাপন করি। সারা রাত গল্প-গুজব, আনন্দ-ফূর্তি করে কাটিয়ে দিই। ভোরে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে যাই। এই ফাকে আমার এক রাতের স্ত্রী সঙ্গে থাকা ডলার, মোবাইল, ঘড়ি ও অন্য দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায়। অনেক পরে ঘুম থেকে উঠে দেখি সব উধাও।

তখন আমি দিশাহারা।

এরপর পুলিশের কাছে মিথ্যা অজুহাত দেখালাম যে, আমার সব কিছু ছিনতাই হয়ে গেছে। আমাকে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

ভাগ্য ভালো ছিল, পুলিশের করুণায় দেশে ফিরতে পেরেছিলাম খালি হাতে। এটি ছিল আমার স্মরণীয় আকাশ ভ্রমণ কাহিনী।

আশা করি, এ ভ্রমণ কাহিনী পড়ে এ রকম বিশ্বসুন্দরীদের খপ্পরে পড়বেন না কেউ।

ফার্মগেট, ঢাকা থেকে

wahid_atoze@yahoo.ca

অলৌকিক

শফিউদ্দিন আহমদ সেলিম

সে সময় সপ্তাহে তিন চার দিন সিলেটে আসা–যাওয়া করতাম। সকালের ফ্লাইটে যেতাম। অফিস করে রাতের ফ্লাইটে ঢাকা ফিরতাম। এভাবে প্রায় একনাগাড়ে দুবছর অফিস করেছি। এর মধ্যে রয়েছে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। বলা যেতে পারে পচাশিজন বিমানযাত্রীর অলৌকিকভাবে নতুন জীবন পাওয়ার কাহিনী।

সে দিনটি ছিল ১৯৯৭ সালের ২২ ডিসেম্বর। অন্যান্য দিনের মতো সকালের ফ্লাইটে নয়, ওইদিন বিকেলে সিলেটে যাওয়ার টিকেট কেনা হলো। আমার সঙ্গে যাবেন আমাদের কম্পানির এক ডিরেক্টর এবং চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

দুদফা ফ্লাইট দেরি হওয়া চারটার বিমান ছাড়লো রাত দশটায়। এফ–টোয়েন্টি এইট ((F-28) বিমানের পচাশিটি সিটই ভর্তি। বিমান এয়ারপোর্ট ছাড়লো দশটা দশ–এ। সুন্দরী এয়ারহস্টেস সিটবেল্ট বাধাসহ নানান বিষয়ে ঘোষণা দিলেন। চল্লিশ মিনিটের ফ্লাইট। সব কিছু ঠিকঠাকই চলছিল। আমার ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে দশটা। হঠাৎ এয়ারহস্টেস ঘোষণা দেন, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে সিলেট এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবো।

আমার একটু খটকা লাগলো। দশ মিনিট আগে ঘোষণা কেন? আমরা ছিলাম বিমানের সামনের দিকে ডানের দ্বিতীয় সারিতে। সিটটা ছিল জানালার পাশে। ল্যান্ডিংয়ের ঘোষণা শোনাতে উৎসুকভাবে বিমানের জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকাচ্ছিলাম এয়ারপোর্ট দেখা যায় কি না। না, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এভাবে আরো কয়েক মিনিট গেল। হ্যা, এবার দেখা গেল আলোকিত এয়ারপোর্ট। কিন্তু না, বিমান তো নামছে না। এয়ারপোর্টের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। তবে আমার মনে হয় তখন দুই একজন বাদে সব যাত্রীই ঘুমাচ্ছিল।

এর কয়েক মিনিট পর রাত দশটা ছয়ত্রিশ কি সাইত্রিশ হবে, বিমানটি হঠাৎ উপর–নিচে জাম্প করতে শুরু করলো। তারপর বিমানটি নিচে নামতে শুরু করেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম, কুয়াশা ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু কোথায় নামছে? আমার মনের ভেতর কেমন যেন সন্দেহ হলো। অজানা আশংকায় মনের ভেতর মোচড় দিল। মনে হচ্ছে নিশ্চিত দুর্ঘটনার দিকে এগোচ্ছি। আর তখনই মনে মনে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে লাগলাম। এর মিনিট এক বা দুই পরেই বিমানটি বিকট শব্দে মাটিতে আঘাত করলো।

আমাদের সামনের সিট এবং পেছনের কিছু অংশ ভেঙে পড়লো। ক্রুদের রুমের পার্টিশনটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। শুরু হলো আর্ত চিৎকার, কান্নাকাটি। বিকট আওয়াজের সঙ্গেই মাটি হেচড়ে বিমানটি এগুতে থাকলো। একই সঙ্গে ভেতরের সিটসহ বিভিন্ন জিনিস ওলট–পালট হচ্ছিল। পনের কি বিশ সেকেন্ড পর বিমানটি থেমে গেল।

দেখলাম আমাদের সামনের সিটের যাত্রী তিনজন নিচে পড়ে আছে। কিছুক্ষণ আগের দাড়ানো এয়ারহস্টেসের মুখমণ্ডল রক্তাক্ত। দুনিয়ার সব কিছু ভুলে চিন্তা করতে লাগলাম যে, মৃত্যু খুব কাছাকাছি। এই বুঝি বিমানটি বিস্ফোরিত হচ্ছে। আমরা মরে যাচ্ছি? ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন সেই অনুভূতি। তখন মনে হচ্ছিল দুনিয়াটার কোনো দাম নেই। জীবনটা অতি তুচ্ছ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যেই দেখলাম গুরুতর আহত এয়ারহস্টেস দৌড়ে গেলেন ইমার্জেন্সি দরজা খোলার জন্য। কিন্তু শক্ত করে আটকে থাকায় তিনি তা খুলতে পারছিলেন না। আমার তখন মনে হলো আমি তাকে সাহায্য করতে পারি। এক লাফে তার কাছে গেলাম সেটি খুলতে এবং চিৎকার করে বললাম, দরজার হাতলটা কোনদিকে ঘোরাতে হবে।

তখন সে ইশারায় বললো, ডানদিকে।

আল্লাহর কি রহমত! জানি না ওই মুহূর্তে আমার হাতেও এতো শক্তি কোথা থেকে এলো। প্রচণ্ড জোরে হাতলটা ঘোরালাম, হাতলটা ঘুরলো এবং দরজা খুলে ফেলাম।

সবার মধ্যে বাচার একটা আশা দেখা গেল। এর মধ্যে একজন যাত্রী লাফ দিয়ে নেমে পড়েন। কোথায় পড়লো বোঝা গেল না। তারপর আমি দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে লাফ দিয়ে নেমে পড়ি। চার পাচ ফিট নিচে পড়লাম এবং বুঝলাম কাদামাটিতে পড়েছি। এবার মনে কিছুটা বাচার আশাও জাগলো। উঠে দাড়ালাম এবং তখনো জায়গাটা যে কোথায় তা বুঝতে পারিনি। এরপর আমার সঙ্গের দুজনকে ডাকলাম নেমে আসতে। তখনো মনে একই ধারণা, এই বুঝি বিমানটা বিস্ফোরিত হচ্ছে। এরই মধ্যে সব যাত্রী দ্রুত বিমান থেকে বের হয়ে আসে এবং বিস্ফোরণের আশংকায় নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে থাকে। মহিলা, শিশু ও আহতদের আর্তচিৎকারে সেখানে এক হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বিমান পড়ার বিকট শব্দ এবং চিৎকার শুনে আশপাশ গ্রামের লোকজন এগিয়ে এলো। তাদের কাছে জানতে পারি এই জায়গাটা এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় পাচ ছয় কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। গ্রামবাসীরা জানালো, তারা নৌকার ব্যবস্থা করেছেন।

সবাই তখন বলাবলি করছিল বিমানের লোকজন কোথায়? এতোক্ষণ হলো বিমানটা অ্যাকসিডেন্ট করলো অথচ বিমান কর্তৃপক্ষ উদ্ধার দল পাঠাচ্ছে না কেন? তাদের কি কোনো দায়িত্ববোধ নেই।

গ্রামের লোকজনের হাতের টর্চের আলোতে আমাদের ক্ষত স্থানগুলো দেখার চেষ্টা করি। এতোক্ষণ আমিও জানতাম না যে আমার চোখের পাশ দিয়ে রক্ত ঝরছে। সবার চিকিৎসা দরকার।

রাত সাড়ে বারোটায় নৌকা এলো। নৌকায় প্রায় আধা ঘণ্টা লাগলো একটি বাসস্ট্যান্ডে আসতে। রাত তখন প্রায় একটা। রাতে এতো লোক কিভাবে সিলেট এয়ারপোর্টে যাবে। গ্রামবাসীর যোগাড় করে দেয়া বাসে করে আমরা রওনা হলাম সিলেট এয়ারপোর্টের উদ্দেশে।

এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখলাম বিমানের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী নেই। সবাই অফিস তালা মেরে এয়ারপোর্ট থেকে পালিয়েছে। আমরা সেখানে সময় নষ্ট না করে ছুটলাম শহরের দিকে। কারণ ঢাকায় তাড়াতাড়ি টেলিফোন করতে হবে। এতোক্ষণে হয়তো তারা জেনে গেছে বিমান দুর্ঘটনার কথা। রাতে ডিসি-র বাসায় গিয়ে ঢাকায় আমার বাসায় ফোন করি। আমার বৌ ঘুম থেকে টেলিফোন ধরলো। তাকে বললাম, দুর্ঘটনার কথা। তারপর বললাম, পনেরো মিনিট পর আবার রিং করবো।

সে কোনো কথা বললো না।

অন্য দুই বাসায় টেলিফোন করার পর বাসায় আবার টেলিফোন করলাম।

তখন আমার স্ত্রী বললো, এটা কিভাবে সম্ভব। বিমান অ্যাকসিডেন্ট করলে কি কেউ বাচে? তোমরা কিভাবে বেচে আছো। স্বপ্ন নয় তো?

বিমান অ্যাকসিডেন্ট করলে কেউ তো বাচে না। তাহলে কে টেলিফোন করলো! আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না *সেলিম* কি স্বপ্ন না বাস্তবে? এই পনেরো মিনিট সে ঘোরের মধ্যে ছিল।

এরপর আমরা সিলেট ওসমানী হাসপাতালে গেলাম। আহত যাত্রীরা হাসপাতালে চলে এসেছে। অ্যাকসিডেন্টের খবর শুনে শহরের সব নেতাও এসেছেন। কষ্টের মধ্যেও ওই দৃশ্যটা ভালো লাগছিল। আবার প্রমাণ পেলাম মানুষ মানুষের জন্য। ডাক্তাররাও সবাই ব্যস্ত। সবাইকে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেয়া হলো। রাতে হাসপাতালের বিছানায় দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ি।

আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি তাদের, যারা ওইদিন আমাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছিলেন।

রমনা, ঢাকা থেকে

শখের তোলা

বাদল সিকদার

কথায় আছে শখের তোলা আশি টাকা।

তারচেয়েও চড়া দামে শখ কিনলাম। ঢাকা থেকে বাস কিংবা ট্রেনে চেপে বাড়ি যাই। সে বছর শখ করলাম বিমানে যাবো। ঢাকা থেকে সরাসরি রংপুরের কোনো ফ্লাইট নেই। নামতে হবে সৈয়দপুর এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে রংপুরের দূরত্ব ছত্রিশ কিলোমিটার। তারপর আরো এগারো কিলোমিটার দূরে আমার বাড়ি। বলাকা ভবন থেকে এগারোশ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে টিকেট কিনলাম। তিন দিন পর ফ্লাইট।

টিকেটের মধ্যে বাসের মতো কোনো ছক কাটা নেই। আসনের ঘরে লেখা সিক্সটিন–এ (16-A)। কাজেই বুঝতে পারলাম না সিট জানালার পাশে কি না। এই তিন দিনে বেশ কয়েকজনকে বিমানে বাড়ি ফেরার কথা জানালাম।

সবাই বাহবা দিল। বললো, তারাও একদিন আমার মতো শখ কিনবে।

দিনটি মনে নেই, সম্ভবত রবিবার বেলা পৌনে দুইটায় ফ্লাইট। এয়ারপোর্টে পৌছাতে হবে পৌনে একটায়। ফতুল্লা থেকে সকাল দশটায় রওনা দিলাম। বলাকা ভবনে পৌছে দেখি তখনো বেশ সময় হাতে আছে। একই ভবনে জিএমজির অফিস। লাউঞ্জে বসে পেপার পড়ছি। পড়ার ফাকে ফাকে আড়চোখে এয়ারহস্টেসের দিকে তাকাচ্ছি। হাজার হলেও শখের ভ্রমণ।

কাউন্টারে দাড়ানো এক মহিলা স্টাফ আমার দিকে কৌতুকভরা চোখে তাকালো। কম বয়স এবং সাধারণ বেশভূষা দেখে মনে হয় আমাকে বিমানের যাত্রী হিসেবে তার পছন্দ হয়নি। পকেট থেকে টিকেটটি অনাবশ্যক বের করে আবার তা পকেটে রাখলাম। আমার পাশে বসা ভদ্রলোকও একই ফ্লাইটের যাত্রী। আমি নতুন তা বুঝতে পেরেছেন।

মাইকে লাগেজ চেকিংয়ের ঘোষণা হলো। ভদ্রলোক বললেন, আসুন, ট্রাভেল ট্যাকস জমা দিয়ে আসি।

সামনের কাউন্টারে পঞ্চাশ টাকা ট্যাকস জমা দিলাম। অর্থাৎ শখের দাম আরেকটু বাড়লো। লাইনে দাড়িয়ে লাগেজ চেকিং শেষ করলাম। পাচশ মিটার পথের জন্য সবাইকে একটি বাসে ওঠানো হলো। বাসটি বিমানের সিড়ির পাশে এসে থামলো।

বিসমিল্লাহ বলে বিমানের সিড়িতে পা রাখলাম। বিমানে উঠে সিট নাম্বার মিলিয়ে দেখলাম জানালার পাশে সিট। বেশ ভালো লাগলো। উপর থেকে সব কিছু খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে পাবো। অন্যান্য যাত্রীর মতো আমিও সিটবেল্ট বেধে নিলাম। বিমান স্টার্ট হওয়ার কিছু সময় পর কাকড়া গতিতে রানওয়ে প্রদক্ষিণ করতে লাগলো। এরপর গতি বাড়ার পাশাপাশি গর্জনের মাত্রা বেড়ে গেল।

এক সময় রানওয়ে ছেড়ে শূন্যের ওপর ভাসলো এবং সাই সাই করে উপরে উঠতে লাগলো। একটু পর মাইক্রোফোনে ঘোষণা হলো আমরা এখন বারো হাজার ফুট উপরে। ভেবেছিলাম জানালার ধারে বসে অনেক দৃশ্য দেখতে পাবো। কিন্তু উপরে ওঠার পর মনে হচ্ছে বিমানটি ঘুড়ির মতো এক জায়গায় দাড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর এয়ারহস্টেস একটি প্লেটে এক ফালি কেক এবং জর্দার কৌটা মাপের একটি গ্লাসে কোল্ড ড্রংকস এনে দিলেন।

এক কামড়ে কেকটি খেলাম। কোল্ড ড্রংকসটুকু এক চুমুকেই শেষ করলাম। বিমানের সিট গুনে এবং জরুরি দরজা খোলার নির্দেশনা পড়ে পড়ে সময় শেষ হলো। এরপর মাইক্রোফোনে বিমান অবতরণের ঘোষণা এলো। পাইলট ফারুকের দক্ষ চালনায় আমরা সৈয়দপুর এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে যাচ্ছি। দয়া করে কেউ সিটবেল্ট খুলবেন না।

এয়ারপোর্টের চারদিকে দুই তিন চক্কর দিয়ে বিমানটি সাই করে রানওয়ে স্পর্শ করলো। এরপর রানওয়েতে ঝড়ের বেগে দৌড়াতে লাগলো।

এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে যেই লাউ সেই কদু হলাম। রিকশা-বাসে করে বাড়ি পৌছাতে রাত আটটা বাজলো। পাচ ঘণ্টার জার্নি দশ ঘণ্টায় সারলাম।

একেই বলে শখের তোলা আশি টাকা।

হারাগাছ, রংপুর থেকে

বাবা

তৌফিক

বাবাকে যখন চিরজীবনের জন্য হারিয়ে ফেলি তখন আমার বয়স আট কি নয় হবে। বাবাকে হারিয়ে বুঝেছি পৃথিবীতে তার মতো কেউ ভালোবাসে না। ছোটবেলায় কোনো কিছু না চাইতেই তিনি কিনে দিতেন। আমাদের পাড়ায় আমার চাচাতো ভাই রনি প্রথম সাইকেল কিনে। পাড়ার ছেলেরা তার পেছনে লেগে থাকতো একটু চড়ার আশায়। আমিও সুযোগ খুজতাম কখন সে ক্লান্ত হবে এবং একটু চালানোর সুযোগ পাবো। মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে ঝগড়া হতো।

বাবা কয়েকবার দেখেও ফেলেন। তিনি একদিন আমার ছোট ভাইয়াকে দিয়ে দামি এবং সুন্দর একটা সাইকেল আনিয়ে দেন। আমি তখন মহা খুশি। এই হচ্ছে আমার বাবা। বাবা মারা যাওয়ার এক বছর আগের কথা। তিনি ঢাকা যাবেন। যাওয়ার আগে আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কি এরোপ্লেনে চড়বি?

তখনো এরোপ্লেন আমার কাছে পৃথিবীর মহা বিস্ময়কর বস্তু। কিছুটা ভয় মেশানো গলায় বললাম *হ্যা*।

আব্বা আমার ঢাকা যাওয়ার কাপড় গুছিয়ে দিতে বললেন মাকে। আম্মা কিছুতেই যেতে দিচ্ছিলেন না। বাবাকে বললেন, ওতো রাতে একা থাকবে না। কান্না করবে।

বাবাকে বললাম, আমি যাবো।

দু চোখে তখন এরোপ্লেনে চড়ার স্বপ্ন।

এটা কিভাবে ওড়ে? উড়লে কি আকাশ ছোয়া যাবে? আর মেঘ কি ধরা যাবে? আরো নানান প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। যদিও মাকে ছাড়া তখন কোথাও একা একটা দিনও থাকিনি। কিন্তু এরোপ্লেনে চড়ার নেশায় সব ভুলে গেলাম। পরের দিন সকালে আব্বা এবং আমি বড় ভাইয়ের শ্বশুর চকরিয়া থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। চট্টগ্রামে রাতে খালুর বাসায় ছিলাম।

পরের দিন সকালে ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করলাম। ঢাকায় বড় ভাইয়ের বাসায় যখন পৌছলাম তখন রাত। আসার পর মন খারাপ হয়ে গেল। বাবাতো এখনো এরোপ্লেনে চড়ালো না। তিন বা চার দিন পর এলো আমার জীবনের সেই কাঙ্ক্ষিত সুযোগ। বাবা বিমানের ঢাকা-চট্টগ্রাম টিকেট কেটে আনলেন।

পর দিন সকালে আমি এবং বাবা আর বড়দার শ্বশুর ট্যাকসি নিয়ে জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে এলাম। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কাঙ্ক্ষিত প্লেনের দিকে এগোতে লাগলাম। দেখলাম অন্যান্য প্লেনের চেয়ে এই প্লেন কিছুটা ছোট। ভয়ে ভয়ে বাবার হাত ধরে প্লেনের সিড়ি দিয়ে উঠে সিটে বসলাম।

আমার সিট পড়েছে জানালার পাশে। এয়ারহস্টেস বাবাকে বললেন, সিটবেল্ট বাধতে।

বাবা নিজের এবং আমার সিটবেল্ট বাধলেন।

প্লেনটা সামনের দিকে উচু হয়ে আকাশের দিকে উড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম শাদা মেঘের ভেলা আর নিচে ফেলে আসা ঢাকা নগরী। সুন্দরী মহিলাটি আমার হাতে কিছু চকোলেট দিলেন। বাবা নিলেন এক গ্লাস পানি। মুগ্ধ নয়নে জানালা দিয়ে নিচের বাংলাদেশ দেখতে লাগলাম। সুন্দর সময়গুলো খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। একটু পরই চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট প্লেন ল্যান্ড করলো। বাবার সঙ্গে বাড়িতে ফিরলাম এরোপ্লেনে চড়ার সুন্দর স্মৃতি নিয়ে।

কষ্টের ব্যাপারগুলো মানুষের ভালো মনে থাকে না। সে কখনো মনে রাখতে চায় না। কিন্তু সুখের ব্যাপারগুলো খুব ভালোভাবে মনে থাকে। কারণ এগুলো নিয়ে প্রায়ই ভাবা হয়। বাবা মারা গেছেন আজ পনেরো বছর হয়ে গেল। তবুও যখন আকাশে কোনো প্লেন উড়তে দেখি তখন দু চোখ ভিজে আসে।

বাবা, তোমাকে খুব মনে পড়ে।

চট্টগ্রাম থেকে

ripon911@yahoo.co.uk

চাপ

বৃটিশ এয়ারওয়েজ। ১৯৯৮ সালের জুন মাসে ঢাকা-দিল্লি-হিথরো হয়ে সুইটজারল্যান্ড যাব। প্লেনে উঠে লক্ষ্য করলাম আমার সিটের পাশে জানালার পাশে সতেরো আঠারো বছরের সুন্দর

এক বালক কাচুমাচু হয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে। পরনে হালকা আকাশি রঙের ঢিলেঢালা শার্ট, জিন্সের প্যান্ট এবং দামি কেডস।

প্লেন ছাড়ার পর নিয়মিত অভ্যাস অনুযায়ী স্টুয়ার্ডকে ডেকে আমার প্রিয় পানীয় গর্ডন-এর ড্রাই জিনের সঙ্গে সোডা ওয়াটার ও লেমন অর্ডার দিলাম এবং ঘুমিয়ে না পড়লে এক ঘণ্টা পর পর ড্রাই জিন সরবরাহ করতে অনুরোধ করলাম। প্লেন দিল্লি ট্রানজিট নিয়ে যখন টেকঅফ করলো তার কিছুক্ষণ পর ড্রাই জিনের তৃতীয় পেগের প্রভাবে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়ার পরই ডান হাতে একটু একটু চাপ অনুভব করছি। সেই সঙ্গে নরম মাংসের স্পর্শ।

মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম পাশের যাত্রী বালক নয় বালিকা। অনুভূতি ভালোই লাগছিল কিন্তু বালিকা বুঝতে পারলো আমি জেগে আছি। কারণ উঠন্ত বুকটিতে তার সাহায্য ছাড়াই চাপছি। এর পর বালিকা আমাকে হালকা করে চুমু খেলো। আমি চোখ খুললাম।

দুজনের চোখেই লজ্জা লজ্জা ভাব। লজ্জা ভেঙে পরিচয় জেনে নিলাম। প্রথমেই ঘুমে বিরক্ত করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বললো, নাম নিমা, বয়স উনিশের কাছাকাছি, বাবা-মায়ের সঙ্গে লন্ডন থেকে দেশে এসেছে বেড়াতে। কিন্তু বাবা-মা বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করায় কাউকে না জানিয়ে লন্ডন ফিরে যাচ্ছে।

কথার মাঝে দুজনেই নিজেদের অনুভূতি শেয়ার করছি। আশপাশের যাত্রীদের রক্ত চক্ষুকে একটা ড্যামকেয়ার ভাব এবং ড্রাই জিনের প্রভাবে দুজনেই আচ্ছন্ন। নির্ধারিত সময়ে প্লেন ল্যান্ড করলো হিথরো এয়ারপোর্টে। ডান হাতটি সরাতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। পরবর্তী গন্তব্য দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা পর সুইস এয়ারে জেনিভা। তাই নিমাকে অনুরোধ করলাম কিছু সময় আমার সঙ্গে থাকার করার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে হবে এই চুক্তিতে রাজি হলো। আমিও খুশি। হিথরো এয়ারপোর্টের বিশাল পরিবেশে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে হাটছি চুমু খাচ্ছি কখনো বা কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলাম। তারপর নিমার ইচ্ছা অনুযায়ী মেক্সিকান খাবার খেতে খেতে কখন যে সময় পেরিয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। ফোন নাম্বার দিয়ে নিমা বিদায় নিলো এবং আমন্ত্রণ জানালো লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত তাদের আড্ডায়।

আমিও সাড়া দিয়ে পা বাড়ালাম।

কিন্তু ফোন নাম্বার হারিয়ে যাওয়ায় ফোন আর করা হয়নি। গত বছর আগস্টে লন্ডন বেড়াতে গিয়ে বন্ধুকে নিয়ে পর পর দুইদিন ট্রাফালগার স্কয়ারে সারা দিন কাটিয়েছি। জানি, দীর্ঘ কয়েক বছর পর তাকে পাবো না। তবুও সান্ত্বনা। হয়তো নিমা এখন অন্য কারো হাতের চাপ খাচ্ছে এবং ভুলে গেছে সেই সাময়িক আনন্দটুকু।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
mahbubadabar@yahoo.com
ইটালি থেকে

অবৈধ

মোহাম্মদ সজিব হোসেন

আমি তখন ছোট। যখন আকাশ দিয়ে বিমান উড়ে যেতো তখন মাকে আবার কখনো ভাইকে প্রশ্ন করতাম, এটা কি বলতো?

বিমান।

এটা কিভাবে উড়ে?

এটা দিয়ে কি করে?

মা বলতো, এটা দিয়ে মানুষ দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায়। দেখতে পাখির মতো, তাহলে মানুষ কোথায় বসে?

বিমান যখন নিচে নেমে আসে তখন বিশাল বড় দেখা যায়।

ভেতরে অনেক লোক থাকে।

২০০০ সালে এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তি হলাম। কিন্তু পড়ালেখা হলো না। আমাদের এলাকায় অনেক লোক বিদেশ থাকে। আমার মাথায় বিদেশ যাওয়ার রোগ চেপে বসলো। আমার বয়সের অনেক লোক মালয়শিয়া থাকতো। তাই তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট করে মালয়শিয়া আসার জন্য সেটা জমা দেই আদম বেপারির কাছে।

আদম ব্যাপারী আজ না কাল করতে করতে একদিন বলে, আগামীকাল তোমার ফ্লাইট। মালয়শিয়া এয়ারলাইন্স।

সব কিছু গুছিয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। ভেতরে গিয়ে বোর্ডিং পাস নিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে মাইকে ঘোষণা করা হলো যারা মালয়শিয়া যাবেন তারা চলে আসুন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা মালয়শিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করবো।

আসনে বসলাম। বিমানে ওঠা শখ ছিল, তাই আমার অনেক আনন্দ লাগলো। বিমান আকাশের দিকে উঠে গেল। জানালা দিয়ে নিচের দিক তাকিয়ে রইলাম। কিছু সময় চলার পর যখন নিচের দিকে তাকালাম তখন আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

পরে এয়ারহস্টেস খাবার নিয়ে এলেন। তাতে ছিল ভাত, মুরগির মাংস, শুকনো রুটি, মাখন, পনির ইত্যাদি। কিছুই খেতে পারলাম না। কারণ ভাতে নারিকেলের ঘ্রাণ ও তরকারিতে নারিকেল তেলের ঘ্রাণ আসে। এয়ারহস্টেসকে বলে শুধু একটা পেপসি খেলাম।

বিমান এক ঘণ্টা চলার পর আমি বিমানের ভেতর হাটছি আর কোথায় টয়লেট, পাইলটরা কিভাবে বিমান চালায় তা দেখার জন্য সামনে গেলাম। কিন্তু এয়ারহস্টেসরা সেখানে দাড়াতে দিল না।

হাটাহাটি করে সিটে এসে বসলাম। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা বিমান চলার পর মালয়শিয়ার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট কেএলএস-এ নামলাম।

বিমান থেকে নেমে কোনদিক যাবো?

তাই আরো লোক ছিল তাদের পেছন পেছন হাটতে লাগলাম। কিন্তু এরই মধ্যে এক অফিসার এসে আমার পাসপোর্ট চাইলে আমি তাকে দিলাম। সে আমার পাসপোর্ট দেখে বললো, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

তার পেছন পেছন গেলাম। আমাকে এয়ারপোর্টে ভেতর এক রুমে আটকে রাখলো। দুই দিন পর আমাকে নিয়ে তারা বিমানে উঠিয়ে দিল। ওই দুই দিনে আমার খাওয়া-দাওয়া কিছু হয়নি। তারা যে খাবার দিয়েছে তা খেতে পারিনি। বিমানে যে খাবার দিল তার থেকে কিছু খেলাম। চলে

এলাম বাংলাদেশ। বন্ধুরা আমাকে তিরস্কার করতে শুরু করলো। এর প্রায় পনেরো দিন পর মালয়শিয়া যাওয়ার উদ্দেশে আবার বিমানে যাত্রা করলাম।

বাংলাদেশ থেকে সিংগাপুর। সিংগাপুর থেকে কুচিং। কুচিং থেকে বিমানে কেএল। সিংগাপুর এয়ারলাইন্সে উঠে খুব ভালো লাগছে। বিমানের প্রতি সিটের সঙ্গে রেডিও, টিভি ফিট করা ছিল। তাই কখনো গান শুনছি কখনো সিনেমা দেখছি। এর মধ্যে এসে নামলাম সিংগাপুর আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট। এখানে তিন ঘণ্টা ট্রানজিট। তাই সিংগাপুর এয়ারপোর্ট সুন্দরভাবে ঘুরে বেড়ালাম। সব কিছু ভালো লাগলো।

অবাক হলাম! এখানে ছোট বাচ্চারা ইন্টারনেট চালাতে পারে। সে বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সিংগাপুর থেকে গেলাম কুচিং। সেখানে এক মাসের ভিসা দেয়া হলো। কুচিং থেকে টিকেট কেটে বিমানে কেএলএসে নামলাম। সরাসরি বাইরে এসে পড়লাম। কারণ কুচিং আর মালয়শিয়া একটি দেশ। তাই এখানে আমাকে আর পাসপোর্ট শো করতে হয়নি।

আকাশ ভ্রমণ করে আমার কাছে মনে হয়েছে যে রুমের মধ্যে বসে আছি বাতাসে সেটা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে অজানা কোনো দেশে।

সব বাধা পেরিয়ে আল্লাহ আমাকে মালয়শিয়া এনেছেন। এখন মালয়শিয়াতে আছি। আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ যাতে সকল প্রকার বিপদ আপত থেকে রক্ষা করেন।

মালয়শিয়া থেকে

হারানো লাগেজ

মেহের

লাগেজ বেল্টটা ঘুরছে। এক এক করে সবাই যে যারটা উঠিয়ে নিচ্ছে। আমি, আমার স্বামী, ছেলে আর তার দুই সিনিয়র ভাই অপেক্ষা করছি, কখন আমাদের লাগেজগুলো বেল্টে আসবে। কি আশ্চর্য! এক ঘণ্টা পরও আমাদের কারো লাগেজ নজরে এলো না। আস্তে আস্তে বেল্ট খালি হয়ে গেল।

আমার স্বামী ও বাকি দুজন ইনফরমেশন ডেস্কে খোজ করতে গেলেন। ছেলেসহ এক পাশে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সময় যেন আর ফোরায় না। বাসা থেকে বের হওয়ার পর থেকে নানান কথা মনে হতে লাগলো। প্রচণ্ড গরমও লাগছে। ছেলেটা খুব অস্থির হয়ে উঠছে।

সময়টা ছিল ১৯৯১ সাল। স্থান তেহরান মেহেরাবাদ এয়ারপোর্ট। দিনটি ছিল রাজীব গান্ধীর নিহত হওয়ার পরদিন। দুবাই ট্রানজিট লাউঞ্জে বসে রাজীব গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের খবর পাই। আর ইরানে খোমেনির সময় মাত্র শেষ হয়েছে। কিছুটা বাতাস বইছে। তবুও দেশি বিদেশি সব নারীই মাথায় কাপড় দেয়া ছিল মাস্ট। চারদিক শুধু টাই বিহীন সুট পরা ছেলে আর উইমেন ইন ব্ল্যাক, কালো আচ্ছাদনে মেয়েরা।

বেশ কিছুক্ষণ পর সানাভাই খবর নিয়ে হাজির। খুবই হাসিখুশি ভাব। একটা চেয়ারে আয়েশ করে বসে বললেন, লাগেজ বোধ হয় আমাদের রেখে লন্ডনের হিথরোতে চলে গেছে।

মাসখানেক আগে ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছি। মালপত্র মনে হয় ওখানকার মায়া ছাড়ছে না।

শুনে টেনশন ও দুঃখে আমার করুণ অবস্থা। ছোট বাচ্চা নিয়ে সেইল করবো। একবার শিপে সাইন অন করলে নেক্সট পোর্ট কখন পাওয়া যায়, ঠিকমতো শপিং যদি না করা যায়, তারপর আমার স্বামীকে যে শিপে দেয়া হয়েছে তার রুট হচ্ছে নর্থ আমেরিকা।

আমি যেন কিছুই ভাবতে পারছি না। আমার স্বামী খুব ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। মনে হয় দুবাইতে লাগেজ ঠিক মতো ট্রান্সফার হয়নি। তাই হয়তো লন্ডনের হিথরো চলে গেছে। বিমান কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে, আশা করি পাওয়া যাবে। কিন্তু কখন তা ঠিক বলা যাচ্ছে না বলেই তিনজন নির্বিকার।

যেন কিছুই হয়নি। সঙ্গে হ্যান্ডব্যাগে ছেলের কয়েক সেট জামা ছাড়া আর কিছুই নেই। ছেলের বয়স তখন এক বছর। পরে জেনেছিলাম, আমার টেনশনে রিলিফ দেয়ার জন্যই নাকি তাদের এই প্ল্যান ছিল।

আমাদের ফ্লাইট ছিল বিমানের ঢাকা-দুবাই-লন্ডন রুট। দুবাইতে প্লেন বদল করে ইরান এয়ারলাইন্সে তেহরান আসি। ঠিকমতো তেহরান পৌছালেও আমাদের ব্যাগেজ চলে যায় প্লেনের সঙ্গে।

এখন মালপত্র ছাড়া ইমিগ্রেশন করাতে হবে। এখানেও আরেক সমস্যা। আমার পাসপোর্টের ছবিটা নাকি ইসলামিক নয়। মানে মাথায় কাপড় ছাড়া। তাই পাসের জন্য মাথায় কাপড় দিয়ে ছবি তোলার ব্যবস্থা করা হলো এজেন্টের পোলারয়েড ক্যামেরায়।

এক কৃমিনালের ছবি যেন । মাথা কপাল ঢাকা শাদাকালো। আসলেই জীবনটা এখানে একদম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, কোনো রঙ নেই। এতো সুন্দর দেশ আর এতো সুন্দর মানুষ। সবাইকে কেমন কালো দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। সত্যিই বিচিত্র। তারপর লাগেজ টানাটানির ঝঞ্ঝাট ছাড়াই একেবারে খালি হাতে এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে এলাম।

সেই আকাশ ভ্রমণ যদিও এয়ারহস্টেসের শুভ কামনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল কিন্তু তা আমাদের জন্য মোটেও সুখকর হয়নি। ঢাকা-লন্ডন ফ্লাইট বলে ফুল বুকড। কোনো এক অজানা কারণে আমাদের কয়েকজন ইকনমি প্যাসেঞ্জারকে বসানো হলো বিজনেস ক্লাসে। *প্রথমত,* আমরা খুব খুশি। বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফৃ (Buy one, get one free)-এর মতো ইকনমি টিকেট দিয়ে বিজনেস ক্লাসে চড়ায়। কিন্তু আমাদের সে খুশি কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বিস্ময়ে পরিণত হলো। সামনের প্যাসেঞ্জার যখন জুস খাচ্ছিল আমার ছেলে মহা কান্না জুড়ে দিল। তারও একটা চাই।

পরে না পেরে আমার স্বামী এয়ারহস্টেসকে বললেন, বিজনেস ক্লাসে কয়েকজন ইকোনমি প্যাসেঞ্জার আছি। আমরা কি এর সুবিধা পাবো?

তখন এক এয়ারহস্টেস তড়িঘড়ি করে চারটা ট্রেতে খাবার ও ড্রিংকস নিয়ে এলেন। টয়লেটের ক্ষেত্রেও প্রায় একই অবস্থা। পুরো সময়টাতে আমাদের গল্পের হুজুরের ওয়াজের মতো *পাতা পানিতে পড়লে কুমির আর ডাঙ্গায় পড়লে বাঘ।* যে পাতা অর্ধেক পানিতে এবং অর্ধেক ডাঙ্গায় তার অবস্থা কি? না কুমির, না বাঘ। না বিজনেস, না ইকনমি ক্লাস।

এরপর তেহরানে প্রায় এক সপ্তাহ অপেক্ষা করার পর আটদিনের মাথায় সব লাগেজ আগের অবস্থায় পাই। কিন্তু এর মধ্যে আমার স্বামীর জন্য নির্ধারিত শিপ চলে যায়। অন্য শিপের জন্য আমাদের আরো দশ-বারো দিন অপেক্ষা করতে হয়।

এক কাপড়ে কিভাবে সাতদিন ছিলাম আর সীমিত টাকায় নতুন করে তেহরানে শপিং করলাম সে ছিল এক মজার অভিজ্ঞতা। তবে এর মধ্যে তেহরানে সব টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন আমাদের ঘোরা হয়ে যায়। তখন খুব টেনশন আর বিরক্তির মধ্যে থাকলেও এখন সেসব স্মৃতি শুধুই আনন্দ দেয়।

পাচলাইশ, চট্টগ্রাম থেকে

এলেবেলে

সরদার আজিজুর রহমান রুবেল

নীল আকাশে শাদা মেঘের ভেলা ফুড়ে হঠাৎ বিকট শব্দে ছুটে যাওয়া একটি পাখি, সবুজ গ্রামের মেঠো পথে হাটতে থাকা পথিক, দুরন্ত কিশোর কিংবা অন্তঃপুরবাসিনী কিংবা তাদের কোলে থাকা শিশুর চোখকেও নিয়ে যায় আকাশে। বিস্ময় অভিভূত চোখ জানতে চায় কারা তারা? যাচ্ছে কোথায়? আকাশের ওপর ভেসে থাকা এ দানবীয় পাখির নাম এরোপ্লেন। সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ চাইতো তারা যদি পাখির মতো উড়তে পারতো! অনেক গবেষণা হলো, হলো অনেক সাধনা। কতো আবিষ্কারক নিহত হলেন, কেউ বা নিখোজ হলেন। অবশেষে মানুষের এ স্বপ্ন বাস্তবে ধরা দিল রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের কল্যাণে। কিছুদিন আগে বিশ্ববাসী প্লেন আবিষ্কারের শতবর্ষ পালন করলেন। প্লেন নিয়ে আমাদের অনেকের রয়েছে অনেক রকম অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স যাদের স্লোগান *আকাশে শান্তির নীড়।*

কিন্তু এ বিমান আমাদের জাতীয় জীবনে অশান্তির কারণে পরিণত হয়েছে। পরিণত হয়েছে এক শ্বেতহস্তীতে। হজ যাত্রী পরিবহনে ব্যর্থতা কিংবা ফ্লাইট জটিলতার কারণে দেশপ্রেমিক বাংলাদেশিরা দেশপ্রেম জলাঞ্জলি দিয়ে অন্য কোনো ক্যারিয়ারের দ্বারস্থ হচ্ছেন। এখন জানাই বিমানের নামে শোনা কিছু ঘটনা।

এক. ছোট ছেলে মাকে বলছে, মা, আমি বড় হলে পাইলট হবো।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কিভাবে বুঝতে পারবো কোন প্লেনটা তুমি চালাচ্ছো?

তড়িৎ উত্তর ছেলের, আমি যখন প্লেন চালিয়ে আমাদের বাড়ির উপর দিয়ে যাবো তখন একটা বোমা মেরে যাবো। তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে আমি কোন প্লেন চালাচ্ছি।

দুই. আমার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ওমরা করতে যাবেন সউদি আরব। তার আবার উচ্চতা ভীতি। কি আর করা ডাক্তার তাকে বুদ্ধি দিলেন, প্লেনে ঘুমের ওষুধ খেতে। ভদ্রলোক আবার এক কাঠি সরস। তিনি বিমানে আসন গ্রহণ করেই ওষুধ খেয়ে নিলেন। কিছু সময় পর জানা গেল এ বিমান যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ওড়ার অনুপযোগী। সবাইকে অনুরোধ করা হলো বিমান পরিবর্তন করে অন্য বিমানে আসন গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু এ ভদ্রলোক তখন ঘুমে। তাকে ওঠানো যাচ্ছে না। তার সহযাত্রীদের সহায়তা নিয়ে তাকে হুইল চেয়ারে করে অবশেষে অন্য বিমানে স্থানান্তরিত করা হলো। নামার পর সবচেয়ে অবাক হলেন ভদ্রলোক নিজে। তিনি জানতেন বিমান যাত্রীদের পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যায় কিন্তু নিজে যে তার খোলস বদলাতে পারে তা তার জানা ছিল না।

তিন. আমাকে সে অনেক দিন বলেছে, আমার সঙ্গেই সে জীবনের প্রথম আকাশ ভ্রমণ করতে চায়। আমি সময় করে উঠতে পারিনি। এখন আমার হাতে সময় অফুরন্ত। কেবল সময় নেই তার আমাকে দেয়ার।

পূর্ব রামপুরা, ঢাকা থেকে
rubel30@yahoo.com

মেহেদি

আয়শা আহমেদ ফেন্সী

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমি, মা, ছোটভাই আব্বার সঙ্গে আকাশপথে কলকাতা যাচ্ছি। উদ্দেশ্য আমার চাচাতো ভাইয়ের বিয়ে। ভীষণ খুশি লাগছিল। বিয়ে মানেই আনন্দ। তার উপর এক দেশ থেকে অন্য দেশ। আমি এর আগেও কয়েকবার আকাশ ভ্রমণ করেছি। কিন্তু এবার যাচ্ছি ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী হয়ে। যেহেতু ফার্স্ট ক্লাস, তাই আয়োজনও ছিল ভিন্ন। প্লেনে ওঠার সময় এয়ারহস্টেসরা ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো। উঠে দেখলাম আট দশজন যাত্রী। বেশির ভাগ বিদেশি। নির্ধারিত সিটে বসলাম। জানালার পাশে। বসার কিছুক্ষণ পর প্লেন দুই ডানা মেলে উড়তে শুরু করলো। ভীষণ ভালো লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এক বিশাল ঈগলের পিঠে চড়ে পৃথিবী ভ্রমণ করছি।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে খেয়াল করছি দুজন বিদেশি আমার দিকে বার বার তাকাচ্ছে এবং নিজেরা কিছু বলাবলি করছে। পাশের সিটে আমার ভাই বসেছিল, সে কিছুক্ষণ পর বাথরুমে গেল আব্বার সঙ্গে। সেই সময় এক বিদেশি এসে আমার পাশে বসার অনুমতি চাইলেন।

অবাক হলাম। তারপরও তাকে বসতে বললাম।

তিনি পাশে বসে অপলক দৃষ্টিতে আমার হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন।

এতোক্ষণ পর বুঝলাম এই দুজন বিদেশি কি দেখছিলেন। তারা আমার দুই হাত ভরা লাল মেহেদি দেখছিলেন যে মেহেদি আমি পরেছি বিয়ে উপলক্ষে।

তিনি আমার হাত ধরার অনুমতি চাইলেন।

হাত বাড়িয়ে দিলাম।

হাত ধরে তিনি কি যে খুশি হয়েছিলেন! তার উপর আরো আশ্চর্য হলেন যখন বললাম, এই রঙ পনেরো বিশ দিন থাকবে। তাকে বুঝিয়ে বললাম মেহেদির রহস্য। গাছের সামান্য পাতা থেকে এতো সুন্দর রঙ হয় জানতে পেরে তারা অভিভূত হয়ে গেলেন। লাল মেহেদির রঙ তাদের এতোই মুগ্ধ করেছিল, তাদের ক্যামেরায় আমার দুই হাত বন্দী করে নিলেন।

সহযোগিতার জন্য তারা আমাকে ধন্যবাদ জানালেন এবং আমার যে কোনো ইচ্ছার কথা জানতে চাইলেন। আমিও চট করে বলে ফেললাম পাইলটরা কিভাবে বিমান চালায় তা দেখার ইচ্ছা আছে। তারা আমাকে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর এসে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি আব্বার অনুমতি নিয়ে তাদের সঙ্গে ভেতরে গেলাম। এবার আমার আশ্চর্য হওয়ার পালা। তারা আমাকে সেখানেই নিয়ে এসেছেন যেখানে বসে দুজন পাইলট খুব দক্ষ হাতে প্লেন চালাচ্ছেন। কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেলাম। কখনোই দেখিনি এ দৃশ্য। মনে হচ্ছে পুরো পৃথিবী আমার সম্মুখে।

প্লেন মেঘের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, ইচ্ছা করলেই ছুঁয়ে দেখা যায়। কি যে সুন্দর অনুভূতি। লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। সেই চার পাচ মিনিট আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত হয়ে রইলো।

প্লেনে চড়ার অনুভূতি সবার জীবনে কম বেশি আছে। কিন্তু আমার মতো পাইলটদের বিমান পরিচালনা দেখার সৌভাগ্য ঠিক কতোজনের আছে জানি না। এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর।

আজো যখন দুহাত ভরে মেহেদি পরি তখনই মনে পড়ে যায় সেই চমৎকার আকাশ ভ্রমণের কথা।

লালবাগ, ঢাকা

গতিময় তারা

কিং সউদ

শূন্যে উড়ে ডানা মেলে শালিক, ধবল, টিয়া
হাজার পাখির হাজার রঙ দেখি জুড়াই মম হিয়া।

কলম ধরলেই শুধু কবিতা লিখতে ইচ্ছা করে। লিখিও মন খুলে। কিছু প্রকাশিত হয় আর কিছু অপ্রকাশিত থেকে যায়। প্রতিদিন প্রেমে, আবেগে, ক্লান্তিতে যখন সুনীল আকাশ পানে তাকাই কতোই রঙবেরঙের পাখি দেখতে পাই। ইচ্ছা জাগে ওই পাখির মতো আকাশে উড়তে। শুধু আমার নয় যুগ যুগ ধরে লাখ লাখ মানুষের হৃদয়ে এ রকম একটা ইচ্ছা কাজ করতো।

খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর সিরিয়াস কল্পবিজ্ঞান লেখক লুসিয়স একটি বই লেখেন। যার নাম দেন ট্রু হিস্ট্রি। তাতে তিনি কাল্পনিকভাবে চাদে যাত্রার কথা তুলে ধরেন, যা বিজ্ঞানসম্মত নয়। তিনি শেষে লিখেছেন, এসব কেউ বিশ্বাস করবেন না।

কল্পনাকে বাস্তব চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছিলেন বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। তিনি তার তুলির মাধ্যমে একেছিলেন গ্লাইডার বিমান, হেলিকপ্টার এবং প্যারাশুট। যা ছিল বিজ্ঞানসম্মত। গৃক পুরাণে ইকারূস ছিল মহাকাশচারী। তার বাবা ডিভালাস এবং সে তাদের মোম এবং পালকের পাখা ঝাপটিয়ে স্বর্গে যেতেন। এ রকম অনেক কাহিনী রয়েছে আকাশে ওড়া নিয়ে। আকাশে ওড়ার স্বাদ মেটানোর জন্য ফ্রান্সের দুই ভাই মসফিরে বেলুন তৈরি করে তার মধ্যে বাতাস দিয়ে আকাশে ওড়ার কিছুটা স্বাদ পেয়েছিলেন। এরপর আকাশে ওড়ার জন্য গ্লাইডার তৈরি করলেন অটো লিলিয়েন্থাল নামে একজন প্রযুক্তিবিদ। গ্লাইডারে এঞ্জিন যুক্ত করে উড়তে গিয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে প্রাণ হারালেন। কিন্তু থেমে থাকেনি মানুষের চেষ্টা, ওড়ার ইচ্ছা। অবশেষে আমেরিকার ওহাইয়ো রাজ্যের ডেটল নামক স্থানে বসবাসরত সাইকেলের দোকানদার উইলবার রাইট ও অরভিল রাইট দুই ভাই ১৯০৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর প্রথম নিয়ন্ত্রিত উড্ডয়ন সম্ভব করেন।

আমেরিকার জাতীয় বিমান ও মহাশূন্য জাদুঘরে রাইট বিমানটি শোভা পাচ্ছে (যেটিকে বলা হয় *কিটিহক ফ্লাইয়ার)*। সেদিন কিটিহক ফ্লাইয়ার ভূমি ছেড়ে তিন মিটার উপরে ওঠে এবং বারো সেকেন্ড ওড়ে। ঘণ্টায় আটচল্লিশ কিলোমিটার বেগ অর্জন করে এবং ছত্রিশ মিটার অতিক্রম করে নিরাপদে নামে। ১৯০৩ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় এক দশমিক আট মিলিয়ন আর এদের ইচ্ছা পূরণ করলেন এ দুই রাইট ভাই। সত্যই মানুষ সৃষ্টির সেরা।

আমার সামান্য জ্ঞান থেকে যা জেনেছি তা তুলে ধরলাম। কিন্তু বাস্তবে যা দেখেছি তা নিয়ে কিছু না বললেই নয়। আমার বয়স তখন পাচ– ছয় বছর। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট তখন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। পিতার চাকরির কারণে নিজ বাড়ি বরিশাল ছেড়ে মঠবাড়িয়া থাকতাম। একদিন সকালে শুনলাম এরশাদ হেলিকপ্টার নিয়ে মঠবাড়িয়া স্কুল মাঠে নেমেছেন। বোনের সঙ্গে দেখতে

গেলাম হেলিকপ্টার। ছোট চোখে তখন হেলিকপ্টার দেখে মনে হয়েছিল যেন বিশাল একটা কাক। যখন সেটা আকাশে উড়াল দিল অবাক হয়ে দেখলাম। বাতাসের চাপে সব ধুলা আমার চোখে গেল। বোনের আচল দিয়ে চোখ পরিষ্কার করার পর যখন খুললাম আর কিছু দেখতে পেলাম না। মনটা অতৃপ্ত থেকে গেল। এরপর শৈশব কেটে কৈশোর এলো। কোনো বিকট শব্দ শুনলেই দৌড়ে বাসা থেকে বাইরে বের হয়ে আকাশের দিকে তাকাতাম। দেখতাম কতো সুন্দর করে পাখির মতো হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছে। তখন ইচ্ছা হতো ম্যাকগাইভারের মতো হেলিকপ্টারের পা ধরে উড়ে যেতে।

নানুর কোলে শুয়ে যখন রাতের আকাশের দিকে তাকাতাম দেখতাম হাজার তারার মাঝ থেকে একটা গতিময় তারা ছুটে চলছে। আসলে ওটা বিমান। পিতার বদলির কারণে কাউখালী আসার পর দেখতাম এখানকার এমপি বর্তমান জেপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু মাঝে মধ্যে হেলিকপ্টার নিয়ে স্কুল মাঠে নামেন। দেখতে যাই এবং সুযোগ বুঝে পুলিশের চোখ ফাকি দিয়ে একদিন হেলিকপ্টারের পাশে দাড়িয়ে ছবিও তুলি। সত্যই একটা রোমাঞ্চকর আনন্দের বিষয়।

আমি মনে মনে বলি, একদিন অনেক বড় মানুষ হবো। সেদিন হেলিকপ্টারে উড়ে বেড়াবো দেশের আকাশ সীমানায়। বিমানে চড়ে উড়ে বেড়াবো এ দেশ থেকে ও দেশে আর যদি কোথাও বনলতা সেনকে পাই তবে তাকে শোনাবো–

হাওয়াই জাহাজে উড়ে উড়ে
এ দেশ ঘুরে ও দেশ ঘুরে
দেখলাম রূপবতী একটিও নেই
এ জগতে সুন্দরী তোমার চেয়ে...।

কিং সউদ
বরিশাল থেকে

পলাতক

হাসান মাহদী

দ্রুত গতিতে ছুটে চলছে গাড়ি জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের দিকে। গাড়ি ড্রাইভ করছে বিপুল। এটা বিপুলের গাড়ি। বিপুলের পাশে মানিকদা। পেছনের সিটে আমি ও প্রিয়ন্তী। আমার এক জীবনের স্বপ্ন। তার দুটো হাত আমার হাতের মধ্যে। পরম নির্ভরতায় আমার কাধে মাথা দিয়ে আছে। এয়ারপোর্টে এসে গাড়ি থামলো। এয়ারপোর্টে ঢুকেই বন্ধু ইমরানকে দেখলাম।

ইমরান কাছে এসেই ঢাকা-যশোর ফ্লাইটের দুটো টিকেট দিয়ে বললো, সব ঠিক আছে তো।

বললাম, হ্যা। এখন পর্যন্ত সব ঠিক আছে।

ইমরান এয়ারপোর্টের একজন কাস্টমস অফিসার। বিপুলের নিজস্ব একটি প্রাইভেট ফার্ম আছে। মানিকদা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। তারা তিনজন শুধু আমার বন্ধুই না, আমার আত্মা। তাদের ওপর সব আস্থা রাখা যায়।

আমাদের সবার গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর। যে গ্রামে রয়েছে বাংলাদেশের একটি আন্তর্জাতিক মানের হসপিটাল। নাম খাজা ইউনুছ আলী মেডিকাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। এ হসপিটাল ক্যান্টিনেই আমি ও প্রিয়ন্তী দেখা করতাম। মাঝে মধ্যে বিপুল, মানিক ও ইমরান আমাদের সঙ্গে আসতো।

হঠাৎ করেই দুপরিবার আমাদের ভালোবাসার কথা জেনে যায়। প্রিয়ন্তীর ওপর শুরু হয় কঠিন নজরদারি। তারপরও একদিন আমরা দেখা করি। সেদিন চার বন্ধু ক্যান্টিনে যাই।

বিপুল, ইমরান ও মানিক বললো, তোদের ভালোবাসার পরীক্ষা নেবো।

কিছুক্ষণ পর প্রিয়ন্তী এলো।

বিপুল বললো, শোনো প্রিয়ন্তী, আমরা চারজন সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজই তোমাদের বিয়ে হবে। এখন তোমার মত কি বলো?

প্রিয়ন্তী আমার দিকে তাকালো। বললো, তোমরা একটা দিন আগে আমাকে জানালে না কেন? তাহলে আমি একটু রেডি হয়ে আসতাম।

ইমরান বললো, আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে সুযোগ পাইনি। আজ মানিকের বাসার সবাই ঢাকা গেছে। এখন আমরা এখান থেকে মানিকের বাসায় যাবো। ওখানে তোমাদের বিয়ে হবে। যদি রাজি থাকো তাহলে হবে, না হলে নয়।

প্রিয়ন্তী বললো, ঠিক আছে চলো।

সেদিন আমি ইচ্ছা করলেই আমাদের বিয়ে হতো। কিন্তু আমি রাজি হইনি। কারণ আমি চাই বিয়েটা সামাজিকভাবে সবার সম্মতিতে হোক।

এর কিছুদিন পর প্রিয়ন্তীর দুলাভাই তাকে ঢাকায় নিয়ে আসে। প্রিয়ন্তী বাংলা কলেজে ভর্তি হয়। তার দুলাভাই তাকে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

আজ সকালে সেলফোনের শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠি। রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে প্রিয়ন্তী বললো, শোনো, দুলাভাই আমাকে না জানিয়ে গোপনে বিয়ে ঠিক করেছে। গতকাল গ্রাম থেকে বাবা-মা এসেছেন। বরপক্ষ আজ আমাকে আংটি পরাতে আসবে। তুমি যেমন করে হোক আমাকে নিয়ে যাও। আমি কিছুই শুনতে চাই না। তুমি এক ঘণ্টার ভেতর এসে আমাকে নিয়ে যাবে।

তার অবস্থান জেনে নিয়ে লাইন কেটে দিলাম। দ্রুত চিন্তা করছি কি করা যায়। প্রথমেই বিপুল, ইমরান, মানিককে ফোন করে বিস্তারিত বললাম। তারপর খুলনার বাসায় ফোন করলাম। কে, ভাবী? শোনো, আজই প্রিয়ন্তীকে নিয়ে আসছি। তুমি যেভাবে পারো বাবা মাকে ম্যানেজ করো। রাখি ভাবী।

প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস সঙ্গে নিলাম। বাসা থেকে বের হতেই বিপুল গাড়ি নিয়ে হাজির। সোজা ফার্মগেট। পথে মানিককে কাজিপাড়া থেকে উঠিয়ে নিলাম। ফার্মগেট থেকে প্রিয়ন্তীকে উঠিয়ে নিয়ে সোজা এয়ারপোর্ট। আজ থেকে তিন চার বছর আগে আমি আর প্রিয়ন্তী এয়ারপোর্টে এসেছিলাম। প্রিয়ন্তীর খুব ইচ্ছা ছিল আমার সঙ্গে ট্রেন ভ্রমণ করবে। তাই দুজন ট্রেনে এয়ারপোর্ট স্টেশন পর্যন্ত এসেছিলাম। এয়ারপোর্ট স্টেশনে নেমে হেটে হেটে এয়ারপোর্টে ঢুকে ছিলাম দুজন। কিন্তু সেদিন কি জানতাম আজ এভাবে এই এয়ারপোর্ট দিয়ে আমাদের পালিয়ে যেতে হবে।

বিপুল বললো, অন্য দেশে হয়তো হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকাকে নিয়ে আকাশ পথে পালিয়েছে এ রকম ঘটনা ঘটেছে বলে শুনিনি।

সময় হয়ে গেল। দুজন বিমানে গিয়ে উঠলাম। তারা তিনজন আমাদের বিদায় জানালো।

আমাদের দুজনেরই প্রথম আকাশ ভ্রমণ।

প্রিয়ন্তী একদম চুপচাপ। কেমন যেন উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকাশের মেঘের দিকে।

তাকে একটু কাছে টেনে নিলাম। ঠোট ছোয়ালাম তার দুই চোখের পাতায়। সে আমার কাধে মাথা রাখলো। জানি না এ আকাশ ভ্রমণ আমাদের কোন সীমান্তে নিয়ে দাড় করাবে। কোন স্বপ্ন সীমান্তে রচিত হবে দুই পলাতকের কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসার বাসর।

এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ থেকে
vbon@cellemail.net

স্বপ্ন

এম কে হাসান

মানুষ কতোই না বিচিত্র স্বপ্ন দেখে। কারো স্বপ্ন সাধারণ আবার কারো স্বপ্ন অসাধারণ। আমার স্বপ্নটি সাধারণ, না অসাধারণ– আমি জানি না। সেই কবে ২০০১ সালে যখন ক্লাস টেনের ছাত্র ছিলাম তখন থেকে স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম বিদেশে যাবো পড়ালেখা করার জন্য। বিমানে আকাশ ভ্রমণ করবো। বিমান থেকে দেশ দেখবো। নীল আকাশ ছোবো। বিমান থেকে নিচে বাড়িগুলো দেখা যাবে ছোট খেলনার মতো। সবুজ মাঠ দেখবো। নীল নীল সাগর দেখবো। সাগর দিয়ে যাবে বিশাল বিশাল জাহাজ। আরো কতো কি স্বপ্ন দেখতাম। এভাবে দিন যায়, মাস যায়, এমনকি বছর পার হয়, আমার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়।

আমার সঙ্গের কতো ছেলে যারা বিদেশে যাওয়ার কথা কখনো ভাবেনি তারা বিদেশে যাবে। এক এক করে অনেকেই বিদেশ চলে গেছে। তারা এখন বিমানে চড়ে অনেক দেশ দেখে। পাহাড়–পর্বত, নদী–নালা, গ্রাম–গঞ্জ, শহর–নগর আরো কতো কি দেখে। আমি এক অভাগা কিছুই দেখতে পারি না। ২০০৪ সালে এইচএসসি পাসের পরে চিন্তা ছিল লেখাপড়ার জন্য অস্ট্রেলিয়া যাবো। অনেক পরিশ্রম করে নিজে নিজে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আইইএলটিএস পরীক্ষা দিলাম। আশানুরূপ স্কোর পেলাম। আকাশ ভ্রমণের ইচ্ছাটা আরো গাঢ় হলো। কিন্তু যাওয়ার কাজ আর এগোয় না।

আমি শুধুই স্বপ্ন দেখি। মাঝে মধ্যে ভাবি আমাদের আশপাশের অনেক লোক বিভিন্ন দেশে খুব সহজেই যাচ্ছে, বিমান ভ্রমণ করছে আর আমি এক হতভাগা শুধুই স্বপ্ন দেখে গেলাম। ২০০৬ সালের ২০ মার্চ আমার জীবনের এক ভয়ানক দিন। অনেক–আশা ভরসা, স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

শুনেছি কতো লোক স্টুডেন্ট ভিসা, ভিজিট ভিসা, ইমিগ্রেশন ভিসা, ওয়ার্কার ভিসা নিয়ে কতো দেশে যাচ্ছে, সহজেই ভিসা পাচ্ছে। কিন্তু আমি এতো কিছু করার পরও পেলাম না। আমার সব স্বপ্ন নিমেষেই শেষ হয়ে গেল।

স্বপ্ন দেখতাম, বিমানের জানালার পাশে বসে আছি। আমার পাসে বশে আছে কোনো এক সুন্দরী বঙ্গললনা। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হারিয়ে যাবো স্বপ্নের জগতে। দুজন দুজনার হাত ধরে বিমানের ভেতর হাটবো। একজন আরেকজনের দিকে চেয়ে থাকবো। সুন্দরী এয়ারহস্টেস এসে আমাদের মোহ ভেঙে দেবে, আরো কতো কি। কিন্তু হায়! আমার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল।

মাঝে মধ্যে ভাবি, হায়রে কি কপাল নিয়ে জন্মেছি! কতো মানুষ বলার সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার ভিসা পেয়ে যায়। বিমানে এখানে–সেখানে যায়। আমি

স্বপ্নবিভোর এক যুবক যার স্বপ্ন শুধু একবার বিদেশে পড়তে যাবে আর বিমান ভ্রমণ করবে। হায়রে বিমান! হায়রে স্বপ্ন!

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

গুড বয়

কামরুল

গত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন ভ্রমণের মধ্যে আকাশ ভ্রমণ আমার জীবনের অন্যতম এক সাফল্য। সাফল্য বলছি এ জন্য, জীবন চলার পথে আমার কোনো সাফল্য নেই। যখন যে কাজই করেছি তার ফলাফল পেয়েছি। এই ছোট জীবনের প্রতিটি দিনই কেটেছে কোনো না কোনো ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে। ব্যর্থতার ঘূর্ণিপাকে পড়ে ভুলেই গেছি সফলতা বলে কিছু আছে।

ছোটবেলা থেকেই একটা স্বপ্ন ছিল প্লেনে চড়ার। দূরে কোথাও প্লেনের শব্দ শুনলেই এক লাফে বেরিয়ে আসতাম চার দেয়ালের ভেতর থেকে আর চেয়ে থাকতাম দূর আকাশের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও প্লেনে চড়ে ঘুরে আসতাম দেশ-বিদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, যা শুধু কল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এভাবে ঘুমের ঘোরে শুয়ে শুয়ে কতোবার যে প্লেনে চড়েছি তার হিসাব নেই। স্কুল পালিয়ে হেলিকপ্টার দেখতে ছুটে গিয়েছি জাতীয় স্মৃতিসৌধের হেলিপ্যাডে। বাড়িতে না বলে কতোদিন যে এয়ারপোর্টে গিয়েছি প্লেন দেখার জন্য তার হিসাব নেই। একদিন এক জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে বলেছিলাম, দেখুন তো আমি কোনোদিন বিদেশে যেতে পারবো কিনা?

উত্তরে যা শুনেছিলাম, সেই কষ্টের কথা পোড়া দাগের মতো আজও লেগে আছে আমার অবুঝ হৃদয়ে।

একদিন সত্যিই যখন প্রবাসে পথে যাত্রা শুরু হলো তখন একদিকে প্লেনে চড়ার আনন্দ, অন্যদিকে মা-বাবার চোখের পানি দুইয়ে মিলে নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছিল। এয়ারপোর্টের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বিমান যখন দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে ফ্লাইং জোনের দিকে তখন মনে পড়ে গেল ছোটবেলার কথা, এতোদিনের পুষে রাখা স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপান্তরিত। হাজার ব্যর্থতার মাঝে যখন একটা সাফল্য বাস্তবে পরিণত ততোক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে বহনকারী প্লেন, যেখান থেকে নীল আকাশ আর শাদা মেঘ ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। সামনে টিভির পর্দায় দেখতে পেলাম ভূমি হতে আমরা বিশ হাজার ফিট উপরে তখন অজানা এক ভয় ধাক্কা দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু প্রথম প্লেনে চড়ার আনন্দের কাছে তা টিকতে পারেনি। দুবাইয়ে যাত্রা বিরতির পর যে প্লেনে আমাদের গন্তব্যে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হলো সেই প্লেনে সিট নাম্বার দেখে রীতিমতো লজ্জায় পড়ে গেলাম।

বোকার মতো দাড়িয়ে আছি সিটের পাশে। এয়ারহস্টেস বোর্ডিং কার্ড দেখে যেখানে বসতে বললেন তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আগে পিছে চিন্তা না করে বসলাম ঠিকই কিন্তু কোনো নড়াচড়া করতে পারছি না, কারণ তিনজনের সিটে আমার দুই পাশে বসা আছেন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি দুই আজব প্রাণী যদি তাদের গায়ে কোনো স্পর্শ লাগে এই ভয়ে। প্লেন ফ্লাই করার কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম আমার বাম পাশের মেয়েটি যিনি জানালার পাশে আছে তার গায়ের জ্যাকেটটি খুলে একটু আরাম করে বসলো অবশিষ্ট আবরণ একটা শাদা গেঞ্জি। ভেতরের

কালো ব্রা স্পষ্ট ফুটে আছে চোখের সামনে। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ চমকানোর মতো কিছু একটা অনুভব করি। নিজ শিরা উপশিরার মধ্যে।

জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখার ভান করে কতো শতবার যে তাকিয়েছি শক্ত করে বেধে রাখা জোড়া বেলুনের দিকে তা বলতে পারবো না। মেয়েদের বুকের দৃশ্য দেখতে এতো সুন্দর হয় ওইদিন না দেখলে হয়তো কোনোদিন বুঝতেই পারতাম না। ইচ্ছা করছে যুগ যুগ ধরে চেয়ে থাকি, কিছুতেই চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করছে না, মনে হচ্ছে বিধাতা নিজ হাতে তৈরি করে ঢেকে রেখেছেন কালো কাপড় দিয়ে। কোনো কিছু দেখার মধ্যে যে এতো আনন্দ লুকিয়ে আছে তা অনুভব করলাম প্রথম আকাশ ভ্রমণে।

মেয়েটা যখন নড়েচড়ে বসে, তখন মনে হয় তার বুকের মধ্যে প্রস্ফুটিত গোলাপ দুটি দুলছে আর আমাকে ইশারা করছে। আমার এই লুকোচুরির অভিনয় বুঝতে পারলো কি না জানি না, নীল আকাশের নিচে উড়ন্ত পাখির মতো যখন গতি থেকে গতিময় তখন কানের কাছে একটা শব্দ ভেসে এল, What is your name? হোয়াট ইজ ইয়োর নেইম? তোমার নাম কি?

বামদিকে তাকাতেই চোখে চোখ পড়ে গেল, কেন যেন একটু ভয় পেয়ে গেলাম, কোন সাড়া শব্দ নেই। আমার নীরবতা দেখে আবারও একই প্রশ্ন।

এক রকম ভীত হয়েই উত্তর দিলাম।

একটু পরে আবার প্রশ্ন, কোথা থেকে এসেছো? কোথায় যাবে? কেন যাবে?

এ রকম প্রশ্নের ধরন দেখে বুঝতে বাকি রইলো না যে আমি ধরা পড়ে গেছি। ভাবভঙ্গিতে স্পষ্ট ফুটে উঠছে আমি যে ভয় পাচ্ছি। কিন্তু প্রশ্ন থেমে থাকেনি। তাই আবারও প্রশ্ন তুমি কি প্লেনে নতুন চড়েছো?

হ্যা।

একেবারেই নতুন?

হ্যা।

এবার নিচের ঠোটটাকে সামান্য একটু বাকা করে ছোট একটা হাসি দিয়ে এমনভাবে বসলো যেন আমাকে আহ্বান করছে তার বুকের মাঝে বিচরণ করতে। বুঝতে পারলো না সেই হাসি দিয়ে নিজে লজ্জা বোধ করলো নাকি আমাকে উপহাস করলো।

দুর্বল মনে প্রচণ্ড সাহস সঞ্চার করে প্রথম প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি হাসলে কেন?

এক প্যাকেট চুয়িং গাম হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, Because you are a good boy. বিকজ ইউ আর এ গুড বয়। কারণ তুমি একটি ভালো ছেলে।

আমি ছিলাম তার চেয়ে বয়সে অনেকটা ছোট।

প্লেন কখন যে ল্যান্ডিং পার্কে এসে থেমে গেছে খেয়ালই নেই।

তারপর থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনে, বিভিন্ন প্লেনে, বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছি কিন্তু প্রথম প্লেনে চড়ার যে স্মৃতি তা আজো স্মৃতি হয়ে মিশে আছে আমার প্রবাস জীবনের সঙ্গী হয়ে।

সউদি আরব থেকে
kamrol8@yahoo.com

আকাশ ভ্রমণ বেশ কয়েকবারই করেছি, দেশের বাইরে না হলেও দেশের ভেতরেই। তার মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনাটা ঘটে আমার বিয়ের সময়। আসলে বিয়েটাই একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা।

তখন আমি ছাত্র। সেকেন্ড ইয়ারের প্রথম টার্মেই বিয়ের সানাই বেজে উঠলো। খুবই সংক্ষিপ্ত ছুটিতে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গায়ে হলুদ, পরদিন বিয়ে এবং তার পরদিন শনিবারে বৌভাত।

বৃহস্পতিবার ক্লাস করে যেতে হবে বলে প্ল্যান করলাম, সকাল এগারোটার ফ্লাইট ধরে সিলেট পৌছাবো। জিএমজি এয়ারলাইন্সের ছোটখাটো বিমানগুলো দেখে কখনো খুব ভরসা পাইনি বলে বাংলাদেশ বিমানের টিকেটই কিনলাম।

কোনো রকমে ক্লাস শেষ করে তড়িঘড়ি ঢাকা এয়ারপোর্টে পৌছালাম ঠিক এক ঘণ্টা আগে। আধঘণ্টা পরই জানতে পারলাম ফ্লাইট দেরি হবে, দুপুর বারোটায় পরবর্তী সময় দেয়া হলো। অস্থির পায়চারি করে ঘণ্টাদেড়েক কাটানোর পর আবারও হতাশ হলাম। জানলাম, ফ্লাইট আরো দেরিতে যাবে। এবার নির্ধারিত হলো বেলা আড়াইটা। এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি জিএমজি এয়ারলাইন্সের বিমান নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যের উদ্দেশে উড়ে যাচ্ছে, একটু ছোট আকৃতির বিমান বলে যেগুলোর টিকেট কিনিনি।

বাসায় ফোন করে জানালাম, আসতে দেরি হবে। এভাবে আরো ঘণ্টা দুই ভোগান্তির পর অবশেষে বিকাল পাচটায় প্লেন ঢাকার আকাশে উড়লো। কিন্তু তারপরও বিড়ম্বনা। সিলেট এয়ারপোর্টের উপর এসে খারাপ আবহাওয়ার কারণে প্লেন ল্যান্ড করতে পারছে না। দুবার ল্যান্ডিংয়ের চেষ্টা করেও পাইলট শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টালেন।

মনে মনে বলছি, হে আল্লাহ, আমার জন্য না হলেও নিষ্পাপ হবু বৌটার দিকে তাকিয়ে প্লেনটা নামিয়ে দাও। আল্লাহ বোধহয় কথা শুনলেন। কারণ এর পরের প্রচেষ্টাতেই পাইলট প্লেনটা ল্যান্ড করাতে সক্ষম হলেন।

এভাবেই শেষ হলো বিয়ের ঠিক আগের দিনে আমার একই সঙ্গে রোমান্স ও বিড়ম্বনাপূর্ণ বিমান ভ্রমণ। বিড়ম্বনাপূর্ণ বিমান ভ্রমণ দিয়ে শুরু হলেও আমাদের বিবাহিত জীবন কিন্তু রোমান্সপূর্ণ। এক মাস পরই আমাদের বিবাহিত জীবনের পাচ বছর পূর্ণ হবে। আমার সুন্দরী বৌটা আমাকে দিয়েছে অসীম ভালোবাসা আর ফুটফুটে একটি সন্তান। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

– নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

কুমিল্লা থেকে

কুয়াশার ভেলকি

মোহাম্মদ কাওছার হোসেন

এই থাম তোরা। কি সব আজে বাজে বকবক করছিস? এবার সবাই যেন একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল। সিনিয়রের কথা, না শুনে উপায় নেই। বলতে শুরু করলো, জানুয়ারির হাড় কাপানো শীতে ওপর থেকে মেসেজ এলো আগামীকাল ঢাকা এয়ারপোর্টে জাতিসংঘ মিশনের জন্য কিছু জিনিসপত্র, গাড়ি বিমানে লোড হবে। গাড়ি লোডের জন্য ড্রাইভার হিসেবে দায়িত্ব পরলো আমার ওপর।

পরদিন যথা সময়ে যাত্রা আরম্ভ হলো। এই প্রথম ঢাকা এয়ারপোর্টে আসা। কুয়াশার কারণে সব কিছু তেমন বোঝা যাচ্ছিল না। সারি সারি গাড়ি এসে জমা হলো এক বিশাল গোডাউনের কাছে। আমি এয়ারপোর্টের রানওয়ের পাশেই গোডাউন দেখে থতমত খেলাম।

সহকর্মী একজনকে বললাম, স্টাফ আমরা তো বিমানে লোড করবো, কিন্তু গোডাউন কেন?

তিনি শুধু মুখ টিপে হাসলো। বললো, বেলা বাড়লেই বুঝতে পারবেন। কুয়াশা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন বেড়েই চলেছে। যথা সময়ে বৈদেশিক মিশনের সৈনিকদের হাজারো ব্যাগ, প্রয়োজনীয় সব কিছু, যুদ্ধাস্ত্র, ট্যাংক, এপিসি, বিশাল সাইজের গান (যুদ্ধাস্ত্র) সব লোড করা হলো। এবার ষাট সত্তরটি গাড়ি তার মানে, পুরো গাড়ির বহর লোড হলো।

এরপরেও তিন তলা সমান উচু গোডাউনের ত্রিশ চল্লিশ গজ খালি থাকলো। যথা সময়ে গোডাউনের দরজা বন্ধ হলো। কখন যে কুয়াশা কেটেছে বলতেই পারি না। কারণ এতোক্ষণ গোডাউনের ভেতরেই ছিলাম। বের হতেই তাজ্জব হয়ে গেলাম।

আরে এ যে কার্গো প্লেন। হাজার হাজার টন ওজন নিয়ে উড়বে কিভাবে?

কার্গো প্লেন যে এ রকমই তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। শুধু নামই শোনা। তবে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল যে এতো কিছু নিয়ে বিমানটি চলতে পারলেও উড়া সম্ভব নয়। কখন অর্ডার আসে জিনিসপত্র আনলোড করার, কিন্তু না। অবিশ্বাস ভঙ্গ করে প্রচণ্ড শব্দ করে প্রপেলার ঘুরাতে লাগলো। প্রপেলার দিয়ে যেন আগুনের হাওয়া বেরুচ্ছে। তারপর পুরো রানওয়ে চক্কর দিয়ে এক প্রান্তে গেল এবং দুর্দম গতিতে সামনে ছুটে যেতে যেতে ঠিকই এক সময় উড়াল দিয়ে অন্তত আমাকে যেন বিশ্বাস করালো কার্গো প্লেনটি যে, I can do everything.

একটি বইয়ে পড়েছিলাম রাইট ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম নিজের তৈরি প্লেনে কিছুক্ষণ উড়েছিলেন। অথচ আজ?

গল্প শেষ করলো মান্নান স্টাফ। শেষে আমি বললাম, স্টাফ সেদিন রাইট ভ্রাতৃদ্বয় বারো সেকেন্ডের মতো উড়েছিল। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের অনবরত উন্নতির ফলে, সেকেন্ড, মিনিট নয়–ঘন্টার পর ঘন্টা আকাশে ওড়া যায়।

আর ওই দুই ভাইয়ের স্থানে আজ কয়েকশ ভাই বসে আকাশে উড়ছে। তবে বিজ্ঞানের এ চরম যুগে আমি খুবই দুঃখিত।

সবাই বললো, কেন?

কারণ মান্নান স্টাফ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল বিমান লোডের সময়। কুয়াশাই তাকে ভেলকি দেখিয়েছে বললাম আমি।

চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে

পরিবহন ধর্মঘট

ফাহমিদা রহমান রিআ

খবর হয়েছে রুমুর প্রবাসী দুলাভাই স্বল্পকালীন ছুটিতে দেশে আসছেন শিগগিরই। বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তদারকিতে। মা ব্যস্ত হয়ে যান আয়োজনে। ভাইয়া ঢাকায় দুলাভাইকে রিসিভ করতে যাওয়ার আনন্দে বিভোর হন বার বার। রুমু বাড়ি থেকে তিনশ কিলোমিটার দূরে আপন কর্মস্থলে ছুটির দরখাস্ত লেখায় তড়িঘড়ি মনোনিবেশ করে।

দিন যতো ঘনায়, সবার অপেক্ষার প্রহর গোনার উৎকণ্ঠা ততো বাড়ে। যাপিত জীবনের এই স্বাভাবিকতার মধ্যে অঘটনঘটনপটিয়সীর ঘোষণা শোনা যায় – *গাড়ির চাকা ঘুরবে না।*

না, এ ডাক দৈনন্দিন জীবনের গা সয়ে যাওয়া বিরোধী দলের উইকএন্ড হরতাল নয়। এ হলো সুনির্দিষ্ট লম্বা লিস্টের দাবি–দাওয়া সংবলিত উত্তর অঞ্চলের অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘট। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, তারিখ বদলায়, ধর্মঘটীদের আব্দার বদলায় না, মঞ্জুরও হয় না। মিটিংয়ের পর মিটিং চলে, অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে যায়।

দিনাজপুরে বাবা–মায়ের টেনশন বাড়ে। ভাইয়া বন্ধ টিকেট কাউন্টারে ঘুরপাক খান। রাজশাহী থেকে রুমুর কান্নাভেজা কণ্ঠ ভাসে মোবাইলে, ছুটি নিয়ে বসে আছি, বাড়ি যেতে পারছি না।

মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, কি আর করবে মাগো। ডানা থাকলে উড়ে আসতেই বলতাম।

নির্দিষ্ট দিনক্ষণে দুলাভাইয়ের প্লেন ল্যান্ড করলো ঢাকায়। পরদিনের প্লেনের টিকেট কেটে রাত যাপনের উদ্দেশ্যে মিরপুরে বড় আপার বাসায় গিয়ে উঠলেন। পরিবহন ধর্মঘটে আক্রান্ত স্বজনরা ফোনে কুশলাদি জানলেন একে একে। রুমু সেই সঙ্গে নিজ দুঃখটাও জানালো। দুলাভাই, আপনি কাল উড়াল দিয়ে ঢাকা–সৈয়দপুর বিমানে পৌছে যাবেন বাড়ি। কিন্তু গাড়ির চাকা না ঘোরা পর্যন্ত আমি নিরুপায়।

দুলাভাই কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, রাজশাহী থেকে সৈয়দপুর হলে তুইও উড়াল দিতে পারিস।

হতাশা ঝরে পড়া কণ্ঠ রুমুর, আমার জন্য তো রাতারাতি নতুন রুট চালু হবে না দুলাভাই।

দুলাভাই দমবার পাত্র নন। ফোন করলেন এয়ারপোর্টে। তিনি জানলেন অভ্যন্তরীণ রুটের ঢাকা–সৈয়দপুরের ফ্লাইটটিই ঢাকা–রাজশাহী হয়ে সৈয়দপুর আসে।

নিশ্চিত হয়ে রুমুকে সংবাদ দিলেন, তুই মোটামুটি তৈরি থাকিস। সকালে এয়ারপোর্টে পৌছেই টিকেট নেবো তোর। ফোন করবো পেলেই।

একে তো বাড়ি যেতে না পারার ব্যর্থতা, তার ওপর আবার প্রথম প্লেনে চড়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা। স্বভাবতই রাত কাটলো রুমুর পুরো নির্ঘুম। সকালে দুলাভাইয়ের চটজলদি ফোন এলো, এখনই রওনা হয়ে যা এয়ারপোর্ট। টিকেট নিয়েছি তোর, *রাজশাহী–সৈয়দপুর* একই প্লেনে।

রাজশাহীর নওহাটা এয়ারপোর্টে অপেক্ষার ক্ষণ পেরিয়ে দেখলো রুমু ঢাকা থেকে উড়ে আসা যান্ত্রিক পাখিটিকে।

নির্ধারিত আসনে বসে সিটবেল্ট বাধতে বাধতে মনে হলো রুমুর, *সত্যিই কি আমি বাড়ি যাচ্ছি? ডানায় ভর করে উড়ে উড়ে?*

দুলাভাইকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে মনে মনে পরিবহন ধর্মঘটীদের জন্য মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। তাদের উদ্দেশে ছলকে উঠলো সুর – *ধন্য আমি ধন্য হে, তোমাদেরই জন্য যে।* আকাশ ভ্রমণ বলে কথা এবং প্রথম।

পাশের আসনে বসা দুলাভাইয়ের কথায় সুরচ্ছেদ হলো, মাত্র ত্রিশ পয়ত্রিশ মিনিটের ভ্রমণ। প্রথম ওড়ার অনুভূতি দেখতে থাক মন ভরে।

পাখিটা তখনই একটু নড়েচড়ে রানওয়েতে দৌড়াতে দৌড়াতে দিল ভো দৌড়। রুমুর মনে হলো প্লেনে নয়, যেন তারই হাতের দুপাশে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা দুটো ডানা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে উচু

থেকে আরো উচুতে। একেবারে মেঘের দেশে। হাত বাড়ালেই যেন পেজা পেজা তুলোর মতো মেঘ ছুতে পারবে। এই বুঝি পরীর দেশের দেখা মিলবে।

সবুজ মখমলের ছোট গালিচাগুলো আর একেবেকে চলা ফিতাগুলো হঠাৎ বড় হতে হতে ফসলের ক্ষেত ও নদী হয়ে গেল। খেলনা বাড়ি-গাড়িগুলো বাস্তবের বাড়ি-গাড়িতে স্পষ্ট হলো। বিশ্বময়ীর পাতা আচলে নেমে পড়লো পাখিটি টুপ করে।

সৈয়দপুর এয়ারপোর্টে হাসিমুখে দাড়িয়ে ভাইয়া তার সহকর্মী মিজানভাইসহ। হাতে রজনীগন্ধার স্টিকের বদলে মোটা দড়ির গোছা। হ্যা, দুই মোটরসাইকেলের পেছনে মালামাল বেধে চারজনের দুটো দল রওনা হলো দিনাজপুর পরিবহন ধর্মঘটকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আর প্রথম আকাশ ভ্রমণের ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে।

ঘোড়ামারা, রাজশাহী থেকে

সেই হাসিটি

এমএ মালেক

ষাট দশকের শেষার্ধে পাকিস্তানের সীমান্ত শহর পেশোয়ারে কোনো নৈশকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। সেই সময়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের ভূত মাথায় চাপে। একজন মন্ত্রীর অনুকম্পায় আমার বদলি হয়ে যায় চট্টগ্রাম স্টেট ব্যাংক শাখায়। পেশোয়ার শহরে আমার সহপাঠী পাঠান বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের, বিশেষ করে ভাইঝি ফিজি ও ললীকে ছেড়ে আসতে হবে এ বেদনায় হৃদয় ছিল ভারাক্রান্ত। ফিজির বয়স নয়, ললীর ছয়। তারা প্রেজেন্টেশন কনভেন্ট স্কুলে পড়তো। পড়াশোনার পর বাকি সময়টুকু চাচাকে ছাড়া তাদের চলতো না। আমি ছিলাম তাদের নিত্য খেলার সঙ্গী। সব কিছু মিলিয়ে তাদের ছিল চাচাময় জগৎ।

আসার দিন তল্পিতল্পা গোছাতে দেখে তারা সন্দেহ করে। কে কোথায় যাচ্ছে কিছুই বলা হলো না। সন্ধ্যার পর পরই আমি তাদের নিয়ে খেয়ে শুয়ে শুয়ে গল্প শোনাতে শুরু করি। উদ্দেশ্য যাতে তারা শিগগিরই ঘুমিয়ে পড়ে। গল্প শুনতে শুনতে সত্যিই তারা আগে-ভাগেই ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের ছেড়ে রাত সাড়ে দশটায় খাইবার মেইলে (Khybar Mail) অশ্রুসিক্ত হয়ে পেশোয়ার ছাড়ি।

পরদিন লাহোরে পৌছি। সেখানে একদিন থাকার সময় পেলাম। সারা দিন লাহোর চষে বেড়ালাম। বাদশাহী মসজিদ, জাহাঙ্গীর টুম্ব, আনারকলি মার্কেট, শালিমার গার্ডেন ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থানে ঘুরলাম। পরদিন পিআইএ-র (Pakistan International Airlines, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স, PIA) ৯০৯ বোয়িংয়ে বেলা আড়াইটায় লাহোর-ঢাকা ফ্লাইট। যথাসময়ে লাহোর ওয়ালটন এয়ারপোর্টে উপস্থিত হই।

আকাশ ছুয়ে মেঘের পাশে ভেসে বেড়ানোর মজাই আলাদা। মনটা ফুরফুরে। ভ্রমণের প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী শেষে বোর্ডিং কার্ড হাতে নিয়ে লাউঞ্জে বসি। তিল ধারণের স্থান নেই। সবাই ব্যস্ত, সবাই অপরিচিত। তন্মধ্যে একজন ভদ্রমহিলার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। কোথায় যেন দেখেছি, চেনা চেনা মুখ অথচ মনে আসছে না।

লাউডস্পিকারে প্লেনে ওঠার আহ্বান জানানো হলো। সুসজ্জিত সিটে বসতেই সেই ভদ্রমহিলাকে আবার দেখলাম। সঙ্গে আরো দুজন। একজন কিশোরী অন্যজন সাত আট বছরের বালিকা। তারা আমার কাছাকাছি সিটের দিকে এগিয়ে এলেন। সুন্দরী এয়ারহস্টেস মিষ্টি হেসে তাদের

বসার সিট দেখিয়ে দিলেন। আমার সিট জানালার এক পাশে। আমার ডান পাশে কিশোরী, অন্য পাশে ভদ্রমহিলা ও বালিকার সিট নির্দিষ্ট।

ভদ্রমহিলার দিকে তাকাতেই তিনি আমাকে বলে উঠলেন ভাই, কিছু মনে করবেন না আপনি কি পেশোয়ার থেকে এসেছেন?

জি হ্যা। কিন্তু আপনি!

নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন। একবার আপনারা ভাই-ভাবীকে নিয়ে ওয়াহ ক্যান্ট অর্ডনান্স ফ্যাক্টরির (Ordnance Factory, Wah Cant) আমাদের বাসায় এসেছিলেন। সেখান থেকে তক্ষশীলা মিউজিয়াম (Taxila Museum) ও রাওয়ালপিন্ডি গিয়েছিলাম।

মুহূর্তে আমার সব কথা মনে পড়লো। এই তো সেই মালতীভাবী। ভাইয়ের বন্ধুর স্ত্রী। লজ্জা পেলাম। মুখে বললাম, ভাবী কিছু মনে করবেন না, ঠিক মনে করতে পারিনি। আপনি যে মনে রেখেছেন এ জন্য ধন্যবাদ।

তা ওই বয়সে মনে রাখার কথা নয়। হেসে বললেন, এখন মনে থাকবে তো?

আবারও লজ্জা পেলাম।

এদিকে কিশোরী আর মেয়েটি দুজনেই জানালার কাছে বসার বায়না ধরেছে।

বললাম, ঠিক আছে, তোমরা দুজন দুজানালার কাছে বসো। আমি ডান দিকে বসবো।

মালতীভাবী মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তার ছোট বোন। চাকলালা বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুলে পড়ছে।

উজ্জ্বল শ্যামলা, ছিপছিপে গড়নের মিষ্টি চেহারার অধিকারী। চমৎকার কাজ করা সালোয়ার-কামিজ পরনে। আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলো। আমিও হাসলাম।

রানওয়ে ছেড়ে প্লেন আকাশে ওড়ার মুহূর্তে সে জানালার কাছে আমার বাম পাশে সিটবেল্ট বেধে বসে পড়লো। তার শরীর থেকে মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ নাকে লাগলো। প্লেন চলছে। নিবিষ্ট চিত্তে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাই। বাম দিকে ঘাড় নেড়ে আমার চোরা চোখের দৃষ্টি মেয়েটির দিকে। দেখি মেয়েটিও তার চোখের দৃষ্টি ডান দিক থেকে বাম দিকে ফেরাচ্ছে। এভাবে আমরা একে অপরকে চুরি করে দেখতে থাকলাম। এক শুভ মুহূর্তে আমরা সময় মতো নিজ নিজ ঘাড় ও চোখ ফেরাতে ভুল করলাম। আর যায় কোথা? দুজনের চার চোখের মিলন। লজ্জা পেয়ে দুজনেই হেসে ফেললাম। অনেকক্ষণ হাসলাম।

পেশোয়ার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে কিছুটা ফ্রি ভাবতে শুরু করি। পেশোয়ারে পাঠান-ললনাদের কাছে আমার হৃদয় চুরি হলেও তা আর এগোয়নি ভাই ও ভাবীর তোপের মুখে। এবার ঠেকায় কে? মেঘের ওপর ভেসে এ বঙ্গ ললনাকে আজ জয় করবোই। প্লেন চলছে পয়ত্রিশ হাজার ফিট উপর দিয়ে। মেঘের ছায়া পড়েছে নিচে সমুদ্রের নীল জলের ওপর। আমার মনের ওপর বাম পাশে উপবিষ্ট মেয়েটির ছায়া।

আমরা দিল্লি, বেনারস শহরের ওপর দিয়ে যাচ্ছি, সি লেভেল থেকে পয়ত্রিশ হাজার ফিট উপরে ইত্যাদি ঘোষণা শুনে মনে বেশ শিহরণ জাগে। ভালোই কাটছিল সময়টুকু। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পূর্ব পাকিস্তান সীমানার মধ্যে ঢুকি। দেখতে দেখতে ঢাকার তেজগাও এয়ারপোর্ট। নির্বিঘ্নে অবতরণ করি।

আমাকে রিসিভ করতে বন্ধুবান্ধব এসেছে। কিন্তু মালতীভাবীর লোকজন দেখা গেল না। তাদের দেরি দেখে এয়ারপোর্টে সাময়িকভাবে সুটকেস ও অন্য জিনিসপত্র রাখার স্থান লেফট লাগেজে আমাদের ব্যাগ ও সুটকেস রেখে অপেক্ষায় রইলাম। তারা এলেন শেষ পর্যন্ত। বিদায়ের ঘণ্টা বাজলো।

বিদায় বেলা দুজনের দৃষ্টি দুজনের দিকে। যতোক্ষণ দেখা গেল মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম। অদ্ভুত এক টুকরো হাসি ছিল তার মুখে।

জেনেছিলাম মালতীভাবীরা রংপুর শহরের মুন্সীপাড়ার বাসিন্দা। অসম্পূর্ণ ঠিকানায় চিঠি লিখেছিলাম। কোনো উত্তর আসেনি। না, মালতীভাবীর না সেই নাম না জানা মেয়েটির। তবে কি সুন্দরী এয়ারহস্টেসের মিষ্টি হাসি আর সেই মেয়েটির অদ্ভুত এক টুকরো হাসির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না? তার হাসি অন্তরের ছিল কি না বোঝা যায়নি।

তেজগাও এয়ারপোর্ট লাগোয়া আমার ছোট একটি বাড়ি। সুস্বাস্থ্য কামনায় সকাল-সন্ধ্যা রানওয়েতে স্ত্রীসহ নিত্য ঘটে আমার পদচারণা। এ পদচারণা শুধু সুস্বাস্থ্য কামনার নয়, অতীতের স্মৃতিচারণও বটে।

শেওড়াপাড়া, ঢাকা থেকে

নানি

মোহাম্মদ আজম

১৯৯৯ সালের অক্টোবর। বারিধারার আমেরিকান এমবাসি থেকে যখন উৎফুল্ল চিত্তে বেরিয়ে এলাম, দেখি বাবা চিন্তিত মুখে এদিক ওদিক পায়চারী করছেন। আমার মুখের হাসি দেখে তিনি বুঝে নিলেন, তার প্রিয় বড় সন্তান আর কিছুদিনের ভেতর টেক্সাস এ অ্যান্ড এম ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করতে ফ্লাই করবে। সাধারণত আমার সাফল্যে বাবা তার ভাষা হারিয়ে শুধু দাত বের করে হাসতে থাকেন। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

ইউএস ভিসা হওয়ার পর যাত্রার যাবতীয় প্রস্তুতির বিবরণ আর দিলাম না। খানিকটা মিক্সড ফিলিংস। আমার ইংলিশ মুভি দেখা ও ওয়েস্টার্ন বই পড়ার পরিমাণ বেড়ে গেল। মায়ের মন দিনকে দিন বিষণ্ন হতে শুরু করলো। ভিসা হওয়ার এবং ফ্লাই করার মাঝে এক মাস সময় পেলাম। আমি টেক্সাস এ অ্যান্ড এম ইউনিভার্সিটিতে স্পৃং ২০০০ সেমিস্টার ধরবো। হাতে অঢেল সময়। তাই নিউ ইয়র্ক হয়ে ডালাস কলেজ স্টেশন নিউ ইয়র্ক। যাওয়ার আরেকটা কারণ ছিল, আমার এক আত্মীয় সম্পর্কের নানিকে তার নিউ ইয়র্ক প্রবাসী মেয়ের কাছে পৌছে দিতে হবে।

আমরা ফ্লাই করলাম ডিসেম্বর-এর প্রথম সপ্তাহে। আমার মন তখন আমেরিকার রঙিন স্বপ্নে বিভোর। মা-র মন খুবই খারাপ। বাবাও গম্ভীর মুখে এয়ারপোর্টের ভেতর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পায়চারী করছেন। সহযাত্রী নানি দেখি দোয়া পড়ে বুকে ফু দিচ্ছেন।

এক সময় সব পেপারওয়ার্ক শেষ হলো। আমি ও নানি প্লেনের ভেতরে এসে বসলাম। একদিকে মন একটু খারাপ অন্যদিকে আনন্দ উদ্বেল। সেই সময়টা ছিল রমজান মাস। নানি প্লেনে রোজা করবেন। তাই আমার দায়িত্ব তাকে সেহরি এবং ইফতার-এর সময় সম্পর্কে জানানো। এ বিষয়টা একটু জটিল। কারণ প্লেন একেক সময় একেক টাইম জোনে থাকে।

আমাদের ফ্লাইট ছিল বৃটিশ এয়ারওয়েজে। ঢাকা থেকে হিথরো। সেখানে ছয় ঘণ্টার বিরতি। তারপর হিথরো থেকে নিউ ইয়র্ক-এর জেএফকে।

ঢাকা থেকে হিথরো যাওয়ার পথে দুই একটি ঘটনা আজও মনে পড়ে। প্লেন তখন বোধহয় ঢাকা এবং হিথরোর মাঝামাঝি কোথাও। এয়ারহস্টেস ডিনার সার্ভ করতে এসে আমাকে বেশ কয়েকটি অপশন দিলেন।

এসব ডিনার মেনু সম্পর্কে এই ভেতো বঙ্গ সন্তানের কোনো ধারণা ছিল না। এয়ারহস্টেসের দুই তিনটি মেনুর মধ্যে একটা ছিল এগ অ্যান্ড সসেজ। তখন জানতাম না সসেজ একটা শূকরের আইটেম।

আমার এবং নানির জন্য একই মেনু অর্ডার করলাম। আমার তখন ধারণা ছিল সসেজ মানে হয়তো টমাটো সস। খাবার আসার পর অবশ্য কোনো টমাটো সসের দেখা মিললো না। বরং ডিমের সঙ্গে একটা সন্দেহজনক বস্তুর দেখা মিললো।

আমি এবং নানি সযত্নে সেই বস্তুটি ভক্ষণ থেকে বিরত থাকলাম। তাই প্লেনে যারা ভ্রমণ করেন তাদের জন্য অনুরোধ, আপনারা টিকেট কাটার সময় এয়ার ট্রাভেলার-এর মাধ্যমে হালাল ফুড অর্ডার করতে পারেন।

হিথরো পৌছালাম রাত চারটা লন্ডন টাইম। এখানে প্রায় পাচ থেকে ছয় ঘণ্টার বিরতি। হিথরো চার টার্মিনাল বিশিষ্ট বিশাল এক এয়ারপোর্ট। আমাদের অবশ্য টার্মিনাল চেঞ্জ করার ঝামেলা করতে হয়নি। ইউএসগামী বৃটিশ এয়ারওয়েজের প্লেনে উঠার আগে ইমিগ্রেশনের লাইনে দাড়াতে হলো। লাইনে দাড়িয়ে আছি এমন সময় এক ইমিগ্রেশন অফিসার আমার কাছে এগিয়ে এলেন এবং নানিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি আপনার সহযাত্রী?

আমি হ্যা সূচক উত্তর দেয়ার পর লাইন থেকে আলাদা করে প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমাদের পাসপোর্ট একটি স্ক্যানার টাইপের যন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দুবার করে স্ক্যান করলেন। এবার আমাদের গন্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন করে। তারপর বোর্ডিংয়ের অনুমতি দিলেন। এভাবে আলাদা করে প্রশ্ন করার মানে খুজে না পেলেও অফিসারের বিনয়ী ব্যবহারে যথেষ্ট মুগ্ধ হলাম।

দীর্ঘ বারো থেকে তেরো ঘণ্টা পর আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে যখন নিউ ইয়র্ক পৌছালাম ক্লান্তি আর অবসাদে আমরা তখন ভারাক্রান্ত দুই মানুষ। নিউ ইয়র্ক ইমিগ্রেশনে অফিসার যথানিয়মে কতোগুলো গৎবাধা প্রশ্ন এবং পাসপোর্ট স্ক্যান করে পরীক্ষা করলেন।

অবশ্য কাস্টমস নানির অতিযত্নে আনা সবজিগুলো ট্র্যাশ ক্যানে ছুড়ে ফেলল এবং এই বলে শাসালো, আমরা যদি এগুলো ডিক্লেয়ার না করতাম তবে বিশাল অংকের আর্থিক জরিমানার সম্মুখীন হতাম।

জীবনে এই প্রথম, এতো দীর্ঘ ভ্রমণে আমি এতোই ক্লান্ত, অফিসারের সব কথায় সায় দিয়ে কাস্টমস থেকে বেরিয়ে এলাম। এর পরের কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত। লাগেজ বেল্ট থেকে আমাদের সুটকেস সংগ্রহ করার মাঝেই আমাদের নিউ ইয়র্ক প্রবাসী আত্মীয় এসে হাজির।

সব কিছু ম্যানেজ করে যখন জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে বের হলাম তখন বেলা প্রায় দুই কি আড়াইটা হবে। নিউ ইয়র্কের ঠাণ্ডা বাতাস আর বৈকালিক নরম সূর্য আমাদের নিউ ইয়র্কে স্বাগত জানালো।

(সসেজ হচ্ছে মিহি কিমা করা মাংসের তেলে ভাজা কাবাব। লম্বায় সাধারণত চার বা পাচ ইঞ্চি। সসেজ যে কোনো মাংসের হতে পারে। ঢাকায় SQUSLY'S, আগোরা এবং নন্দন-এ চিকেন এবং বিফ সসেজ পাওয়া যায়। তবে ইওরোপের বেশিরভাগ সসেজ-ই পর্ক সসেজ (পর্ক

অর্থাৎ শূকরের মাংস)। টমাটো সস দিয়ে সসেজ এবং চিপস শিশুদের প্রিয় খাদ্য ইওরোপ এবং আমেরিকায়। –যাযাদি)

সিয়াটল থেকে
ululazam1000@yahoo.com
kingshook1000@yahoo.com

ব্রেইন ওয়েভ

গোলাম সারওয়ার

পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্য। সাহসীরাই পৃথিবী জয় করেছেন। আমিও সাহসী এবং ভাগ্যবান মানুষদের একজন। কারণ প্লেনে চড়তে যে সাহস লাগে তা আমার ছিল। তাই প্লেনে চড়া সম্ভব হয়েছে। অনেকেই প্লেনে চড়তে সাহস পান না। আবার হতদরিদ্র দেশে অনেকেরই প্লেনে চড়ার ভাগ্য হয় না। তবে তাদের দুর্ভাগ্যবান বলা যাবে না। বরং নদীমাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশে যারা এখনো নৌকা ভ্রমণ করেননি, বিনা টিকেটে ট্রেন জার্নি করার বদঅভ্যাস এখনো যারা ছাড়েননি, তাদের দুর্ভাগ্যবান বলা যেতে পারে।

প্রথম প্লেন দেখি ছোটবেলায়। গ্রামের ওপর দিয়ে নীল আকাশের নীরবতা ভেঙে শাদা মেঘ বিদীর্ণ করে ভো ভো শব্দে *উড়াল জাজ* (উড়োজাহাজ) যখন অনেক উচু দিয়ে উড়ে যেতো তখন। আমরা ছোট শিশুরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতাম যতো দূর দৃষ্টি যায়। সেই অনেক শিশুর মাঝে একদিন আমার ভাগ্য হয় প্লেনে চড়ার। ঢাকা টু সিলেট কিংবা সিলেট টু ঢাকা এ গন্তব্যে বেশ কয়েকবার আকাশ ভ্রমণ করার সুযোগ হয়।

১৯৮৩ সাল। ঢাকা থেকে সিলেট আসবো। ইচ্ছা হলো প্লেনে চড়ার। মতিঝিল বিমান অফিস থেকে তিনশ চল্লিশ টাকায় টিকেট সংগ্রহ করি। প্রসঙ্গত একটি কথা বলে নেয়া দরকার। আমার জানা মতে, বেশির ভাগ মানুষই প্রথম প্লেনে চড়েন পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে এমন কাউকে নিয়ে। অর্থাৎ বাবা, চাচা, ভাই, মা, বোন, বন্ধু প্রমুখের সঙ্গে। আমার সঙ্গে কেউ ছিলেন না। তখন কলেজে পড়তাম। প্লেনে চড়ার আগে এবং এয়ারপোর্টের ভেতরে যাওয়ার আগে মুহূর্তে বেশ উত্তেজনা অনুভব করলাম।

নির্ধারিত দিনে এয়ারপোর্টের ফর্মালিটি শেষে প্লেনে উঠলাম। সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই সুন্দর মুখের অভ্যর্থনা গ্রহণ করলাম। তাদের আতিথেয়তায় বোর্ডিং পাস অনুযায়ী সিটে বসলাম। যখন সিটবেল্ট বাধার সংকেত দেয়া হলো তখন পড়েছিলাম মহা বিপদে। সিটবেল্ট কিভাবে বাধতে হয়, জানি না। পাশের জনকেও জিজ্ঞাসা করছি না। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ একজন অপরিচিতা। তবে আড়চোখে দেখে নেয়ার চেষ্টা করি। না, ব্যর্থ হলাম।

আসলে অন্যের ওপর নির্ভর করলে শেষ পর্যন্ত হতাশই হতে হয়। নিজের কাজ নিজে করার মাঝে সাচ্ছন্দবোধ ফিরে পাওয়া যায়। ইচ্ছা করলে এয়ারহস্টেসের সাহায্যও নেয়া যেতো। তবু নিজের চেষ্টায় এক সময় সিটবেল্ট বেধে ফেলি।

মনে মনে ভাবি, সিটবেল্ট বাধা তো হলো। খোলার দরকার হবে, খুলবো কি করে?

টানতে লাগলাম এমনভাবে কেউ যাতে টের না পায়। খুলতে না পেরে ধীরে ধীরে ঘর্মাক্ত হলাম। মাথা ঠাণ্ডা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে লক্ষ্য করলাম বেল্টের মাথায় Pull লেখাটির প্রতি। বাম

হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে উপরের দিকে তুলে ডান হাতে আস্তে করে টান দিতেই খুলে গেল যেন চিচিং ফাক। কি যে আনন্দ হয়েছিল তখন!

প্লেন যখন রানওয়ে থেকে ফ্লাই করে উপরের দিকে উঠতে থাকে নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত তখন অনুভব করলাম শরীরের ভারসাম্য যেন বজায় থাকতে চাচ্ছে না অর্থাৎ ব্রেইন ওয়েভ উপরের দিকে উঠে যেতে চাচ্ছে। আবার যখন প্লেন নিচের দিকে নামতে থাকে তখন ব্রেইন ওয়েভ যেন নিচের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়।

আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, প্লেন যখন আকাশে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে তখন মনে হয় তা একই জায়গায় অর্থাৎ শূন্যে দাড়িয়ে আছে। অথচ ঠিক বাইশ মিনিটেই আমরা পৌছে গেলাম সিলেটে। কি আশ্চর্য! ইটস এ ম্যাজিক, তাই না?

তাতীপাড়া, সিলেট থেকে

চেকিং

ইকবাল

প্রথম প্লেনে চড়েছিলাম মনে হয় ১৯৪৭ সালে। সেটা ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটি ভাঙা প্লেন। ১৯৬৭ সাল থেকে চাকরির সুবাদে নিয়মিত ঢাকা-যশোর এবং যশোর-ঢাকা আসা-যাওয়া করেছি।

১৯৭০ সাল। ইনডিয়ান প্লেন *গঙ্গা* হাইজ্যাক করে লাহোরে নিয়ে খুব সম্ভবত পুড়িয়ে ফেলেছে। তাই ঢাকাতেও খুব কড়াকড়ি। সিগারেট খেতাম। তাই লাইটারের জন্য ফিউয়েল নিয়ে যাচ্ছি। এয়ারপোর্ট চেকিংয়ে বোতল রেখে দিল। একটি রসিদ চাইলাম। সিকিউরিটি অফিসার বললেন, আমি বাঙালি বলে শুধু বোতলটা রেখে দিলাম, ওই মাওরাগুলো (নন বেঙ্গলি) হলে বোতলসহ আপনাকেও রেখে দিতো। পাচ সিকের ওই বোতলটার কথা ভুলে যান।

ঢাকা থেকে যশোর যেতাম বিকেলের ফ্লাইটে আবার যশোর থেকে আসতাম সন্ধ্যার ফ্লাইটে। সব সময়ই জানালার পাশের সিট নিয়ে নিচে তাকিয়ে নদী, ক্ষেত, রাস্তা দেখতাম।

একদিন বাম দিকে বসে জানালা দিয়ে রানওয়ের প্লেনের দৌড় দেখলাম। টেক অফ দেখলাম, চাকা গুটিয়ে তার জায়গা মতো ঢুকতে দেখলাম। তারপরই হলো মজা।

হঠাৎ দেখি চাকার কভারের পাশের তিন ফিট × তিন ফিট মাপের একটি সিট খুলে গিয়ে শূন্যে ঝুলছে। পাশের সিটের যাত্রীকে দেখাতেই সে চিৎকার করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলতে লাগলো।

তার চিৎকার শুনে সব যাত্রী আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে। জানালা দিয়ে তাকাতে বললে দুই একজন জানালা দিয়ে দেখে তারাও ভয়ে চিৎকার। এ সময়ের মধ্যে ওই সিটটি নিচে পড়ে গিয়েছে। আরো নতুন একটি সিট খুলে একটি স্ক্রু-র সঙ্গে আটকে ঝুলে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দুলছে।

চিৎকার শুনে স্টুয়ার্ড কাছে এসে জানতে চাইলো কি হয়েছে। তাকে জানালা দিয়ে তাকাতে বললাম।

সে দেখে কিছু না বলে সোজা ককপিটে গেল।

ক্যাপ্টেন এসে বললেন, What happened? হোয়াট হ্যাপেনড? কি হয়েছে।

বললাম, Just look through the window. জাস্ট লুক থ্রু দি উইনডো। জানালা দিয়ে দেখুন।

That's nothing দ্যাটস নাথিং। কিছুই না। বলে ক্যাপ্টেন চলে গেল।

পরক্ষণেই স্পিকারে শুনতে পেলাম, We are going back to Dhaka. ওই আর গোয়িং ব্যাক টু ইনডিয়া। ইনডিয়াতে আমরা ফিরে যাচ্ছি।

এতোক্ষণ মজা পেলেও পরে ভয় পেয়ে গেলাম।

যাহোক, নির্বিঘ্নে ঢাকায় ল্যান্ড করলো। ওই সময় যারা ভয় পেয়ে চিৎকার করে কান্নাকাটি করছিল তারা এখন পিআইএ-এর খরচে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে রাত কাটানোর খুশিতে ডগমগ।

বললাম, খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। সিলেট বা চিটাগাং থেকে একটি প্লেন এলেই আমাদের উঠিয়ে দেবে।

ঠিক তাই হলো। প্রথমবার যে চকোলেট ও টফি দিয়েছিল এবার তাও দিল না।

১৯৭৯ সালে ট্রেনিংয়ে আমেরিকা যাচ্ছি। থাই এয়ারলাইন্সে ঢাকা-দিল্লি-লন্ডন হয়ে ওয়াশিংটন যাওয়ার কথা। কিন্তু ওই সময় পর পর কয়েকটি ডিসি-টেন (DC-10) অ্যাকসিডেন্ট করায় সব ডিসি-টেন প্লেন গ্রাউন্ডেড। তাই ইনডিয়ান এয়ারলাইন্সে কলকাতা হয়ে দিল্লি। সেখানে টিকেট কনফার্ম না থাকায় চার দিন হোটেলে থেকে এয়ার ইনডিয়ার বোয়িং সেভেন-ও-সেভেনে ফ্র্যাংকফুর্ট হয়ে হিথরো। দুইদিন লন্ডন থেকে বৃটিশ এয়ারওয়েজে সোজা ওয়াশিংটন ডিসি। সেখানে পাচ দিন থেকে ডেলটা এয়ারলাইন্সে করে আটলান্টা হয়ে লুইজিয়ানার রাজধানী ব্যাটনরজ।

যানজট কথাটা তখন অচেনা হলেও লাইনে দাড়ান কথাটা সুপরিচিত ছিল। কিন্তু প্লেনের লাইন আমার কাছে অকল্পনীয়। আমরা রানওয়েতে তেইশ নাম্বারে আছি তার মানে সামনের বাইশটি প্লেন উড়লে আমরা উড়বো। ট্রেনিং শেষে প্যান অ্যাম-এ লন্ডন। উদ্দেশ্য লন্ডনে বন্ধুদের সঙ্গে দুই তিন দিন কাটাবো। আমেরিকাতে যতো ওজনই হোক না কেন দুটি সুটকেস ফৃ।

সহকর্মী বন্ধু লুৎফর বললো, লন্ডনে দুই তিন দিন থাকবো আর এর মধ্যে আমাদের লাগেজ আগেই পৌছে যাবে।

চুরি হতে পারে। তাই তার কথা শুনে লাগেজ রিসিভ করেছিলাম। এখানেই করলাম ভুল। চেক ইন করতে গিয়ে দেখি লাগেজ ওজন করছে। চুরানব্বই কেজির চার্জ চারশ চোয়ষট্টি পাউন্ড। ভেতরে যে মাল আছে তার দাম চারশ ডলারও হবে না। চুরানব্বই কেজির ষাট কেজির বেশি হবে। বিভিন্ন ধরনের স্ক্রু ড্রাইভার, প্লায়ার্স যাবতীয় লোহার ভারী জিনিস। ভাবলাম, এই মহিলা বোধহয় ভুল করেছে।

তাই সঠিক জানার জন্য পাশের ডেস্কের মহিলার কাছে যেই গিয়েছি ওই মহিলা দৌড়ে এসে বললো, তুমি কি মনে করেছো এ সুন্দরী যুবতী তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে। তোমাকে কোনো রকম সুবিধা দেবে। চার্জ কমিয়ে দিতে পারবে। ওজন কমিয়ে দিতে পারবে। কিছুই পারবে না। আইন, আইনই। আমি তার থেকে অনেক বয়স্ক। বলে দিলাম, তোমাকে চোরানব্বই কেজিরই চার্জ দিতে হবে। আমার বন্ধু আবু লাইস আমাকে সি অফ করতে এসেছিল।

সে আমাকে দেখিয়ে বললো, সে তো ভালো ইংরেজি জানে না। তোমার কথা বুঝতে পারেনি। তাই পাশের ভদ্রমহিলার কাছে গিয়েছিল।

ভদ্রমহিলা আরো রেগে গিয়ে বললো, তুমি আমাকে বোকা পেয়েছ। তার কাগজপত্র বলছে সে আমেরিকাতে ট্রেনিং করেছে, সে ভালো ইংরেজি বোঝে না, তাই না। সেখানে তাকে ইংরেজিতে কথা শুনতে হয়েছে। বলতেও হয়েছে। সে খুব ভালো ইংরেজি বলেছে, আমিও খুব ভালো বুঝেছি।

কি আর করা! সহকর্মী, সহযাত্রী ও বন্ধু আজিজের কাছ থেকে দুইশ ডলার নিয়ে আবু লাইসকে দিলাম আর ওই সুটকেস দুটো কার্গোতে পাঠানোর জন্য রেখে এলাম। পরে সে জাহাজে করে পাঠিয়েছিল। আল্লার অশেষ রহমত কিছুই খোয়া যায়নি।

মজার শেষ নেই। তিন সহকর্মী পাম্প সিসটেমের তিনটি এয়ারগান আমেরিকা থেকে কিনেছিলাম যেগুলো লন্ডন পর্যন্ত প্লেনে হাতেই ছিল কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু এখন এগুলো দেখাতে হবে।

প্যাকেট খুলে দেখিয়ে যেই বলেছি এটা এয়ারগান, তেমনি তাদের চোখ চড়কগাছ। চিফ সিকিউরিটি অফিসার না আসা পর্যন্ত বসে থাকতে হলো। এদিকে মাইকে আমাদের তিনজনের নাম ধরে অ্যানাউন্স হচ্ছে। আমাদের অনুরোধে সিকিউরিটি থেকে প্লেনে আমাদের সমস্যা সম্পর্কে জানালো। বলা হলো দেরি করতে ।

প্রায় আধা ঘণ্টা পর চিফ এলেন। দেখি চিফ এক শিখ ভদ্রলোক। কিভাবে এটা দিয়ে গুলি করতে হয়, গুলি দেখতে কেমন জানতে চাইলে বুঝলাম সত্যিই এটা নতুন ধরনের এয়ারগান। তারা মনে হয় আগে দেখে নাই। জানালাম, গুলি লাগেজের মধ্যে করে চলে গেছে আর এভাবে মারতে হয়।

ভদ্রলোক নেড়েচেড়ে দেখে সন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হলো আর এগুলোর কোনো লাইসেন্স লাগে না জেনে ছেড়ে দিল। এদিকে প্রায় এক ঘণ্টা লেট। প্লেনের ভেতরে ঢুকতেই সবার রাগত চোখ আমাদের দিকে। যা হোক ঢাকায় ঠিক মতোই পৌছলাম।

২০০০ সালে স্টাডি টুর–এ অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম। ফেরার সময় সিংগাপুর থেকে ঢাকা ফ্লাইটে যাত্রীর প্রায় আশি ভাগ শ্রমজীবী বলে মনে হলো। প্লেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পর একজন সিটে উঠে বসে চিৎকার করে গান গাওয়া শুরু করলো। মনে হলো প্লেনটাই বাংলাদেশের কোনো একটা গ্রাম। কিছুক্ষণ পর সে সিংগাপুরের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বলতে লাগলো। প্লেনে সে কতোবার জুস খেয়েছে। আঠারো বার পর্যন্ত জুস খাওয়ার রেকর্ড আছে তার।

২০০১ সালে চিকিৎসার জন্য কলকাতা গিয়েছিলাম। ফেরার সময় ইমিগ্রেশনের এক অফিসার বলেই বসলেন, *দাদা চা খাবার জন্য কিছু দিয়ে যান*।

আমার মনে হলো দুর্নীতিতে বাংলাদেশ নয়, বাঙালিরা এক নাম্বার।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

বিজি

নজরুল ইসলাম খোকন

২০০৬ সালের ২০ মার্চ। Malacca Industrial Skills Development Centre (MISDEC)–এর আমন্ত্রণে দশ দিনের মালয়শিয়া সফরের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে গিয়ে সকাল থেকেই অপ্রিয় সব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পরমাত্মার অপার কৃপায় জিয়া এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হলাম রাত নয়টায়। আগেই বলে নেয়া দরকার আমার ফ্লাইট

শেডিউল রাত সাড়ে বারোটায়। ফ্লাইট নাম্বারঃ বিজি জিরো জিরো এইট টু। আমাকে বিদায় জানাতে তাজুভাই, বন্ধু জিয়া এবং মনির এয়ারপোর্টে আসে। তাজুভাইয়ের সঙ্গে বিদায়পর্ব এয়ারপোর্টের বাইরেই শেষ করে জিয়া এবং মনিরকে নিয়ে আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম।

তাদের দুজনকে ওয়েটিং রুমে বসতে বলে বোর্ডিং পাশ কাউন্টারের দিকে এগোতে থাকলাম। উদ্দেশ্য বোর্ডিং পাশ নিয়ে তিনজন একসঙ্গে বসে বাকি সময়টা কাটিয়ে দেবো। ইমিগ্রেশন পার হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাকে যেন বিরক্তিকর সময় কাটাতে না হয়। বোর্ডিং কাউন্টারের কাছাকাছি আসতেই এক ভদ্রলোক জানতে চাইলেন আপনার ফ্লাইট কোনটা।

বললাম, বিজি- জিরো জিরো এইট টু, BG-0082। কোনো রকম সৌজন্যতা ছাড়াই তিনি উত্তর দিলেন, লাভ নেই, ফিরে যান।

বললাম, মানে?

মানে এ ফ্লাইট আজ যাবে না।

কেন?

বলতে পারবো না বিমানের সেলস সেন্টারে গিয়ে খোজ নিন।

কি আর করা কিছুটা হতাশা আর অনেকটা বিস্ময় নিয়ে সেলস সেন্টারে গেলাম। দায়িত্ব পালনরত ভদ্রলোকের কাছে ব্যাপারটি জানতে চাইলাম।

জি, ঠিকই শুনেছেন। ফ্লাইট বারো ঘণ্টা ডিলেইড। নতুন শেডিউল আগামীকাল দুপুর বারোটা ত্রিশ মিনিটে।

বললাম, এতোবড় শেডিউল বিপর্যয়ের কারণটা কি জানতে পারি?

কারণ জানতে চেয়ে যেন মহা অপরাধই করে ফেললাম।

ভদ্রতা মেশানো ধমকের সুরে বললাম, কারণ জানতে চেয়ে নিঃসন্দেহে অপরাধ করিনি। এতো বড় শেডিউল বিপর্যয়। আপনারা প্যাসেঞ্জারদের জানাননি কেন?

ভদ্রলোক খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই উত্তর দিলেন, আপনি কি বাংলাদেশ বিমানে এই প্রথম?

বললাম, বিমানের রিপিট প্যাসেঞ্জার হওয়ার দুর্ভাগ্য আশা করি আমার কোনোদিনই হবে না।

এ পর্যায়ে বোধোদয় হলো, বিমানের প্যাসেঞ্জার হয়ে এখানে সময় নষ্ট করাটা আসলেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমানের শেডিউল বিপর্যয়ের কল্যাণে আমার মতো অনেক সৌভাগ্যবান (!) যাত্রীই আরো একটা রাত প্রিয় মাতৃভূমিতে থাকার সুযোগ পেল। ঢাকার বাইরে দূর-দূরান্ত থেকে যারা এসেছেন তাদের ভাগ্যে বোনাস হিসেবে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। বাসায় ফেরার পথে মনে হলো মাতৃভূমিতে থাকার এ সুযোগটা যে আসলে কদিনের জন্য পেলাম আল্লাহই ভালো জানেন।

পরদিন সকালে বিমানের তথ্যকেন্দ্রে ফোন করে জানতে চাইলাম, BG-0082-র নতুন শেডিউলটা এখনো পর্যন্ত ঠিক আছে কি না।

ওপাশ থেকে ভদ্রলোক বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে চলে আসেন তো। দেখা যাক।

অনেক দোয়া-দরুদ পড়ে আর মায়ের দোয়া সঙ্গে নিয়ে সকাল নয়টায় এয়ারপোর্টে পৌছালাম।

মাথায় তখনো রাজ্যের সংশয়। বোর্ডিং পাশ ও ছোটখাটো ঝামেলাগুলো শেষ করে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে এলাম সাড়ে এগারোটায়। ইমিগ্রেশন অফিসার প্রথমেই জানতে চাইলেন, বাড়ি কোথায়?

বললাম, মেহেরপুর।

মালয়শিয়া কেন যাচ্ছেন?

বিজনেসের কাজে।

আর কি করেন?

জি, আমি পাশাপাশি MBA পড়ছি।

আপনার বয়স?

বললাম চব্বিশ, পাসপোর্টেই তো দেয়া আছে।

আপনি এতো কম বয়সে পড়াশোনার পাশাপাশি বিজনেস করছেন, ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না?

বললাম, প্রয়োজনীয় প্রশ্ন থাকলে করেন!

ভদ্রলোক সুবিধা করতে না পেরে বেশ দ্রুত কাজ সারলেন। ইমিগ্রেশন শেষ করে লাউঞ্জে বসে থাকলাম একটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত।

সব সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে বিমানের এয়ারক্রাফট যখন ফ্লাই করলো তখন বেলা দেড়টা।

লেখাটা এখানেই শেষ করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু তা পারিনি যে কারণে সেটা হলো আমার রিটার্ন টিকেট যে, ৩০ মার্চ BG-0083 তে।

মালয়শিয়ার দিনগুলো খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেল। অবশেষে ফেরার পালা। ফিরতি টিকেট রিকনফার্ম করলাম ১ এপৃল সকাল সাতটা পাচ মিনিটে। BG-0083 তে। বলে নেয়া দরকার কুয়ালা লামপুর এয়ারপোর্ট সিটি থেকে আশি কিলোমিটার দূরে। কাজেই আমি ট্যাকসি যোগে রাত দুইটা ত্রিশ মিনিটে রওনা করলাম এয়ারপোর্টের উদ্দেশে। মাহাথিরের স্বপ্নের শহর কুয়ালা লামপুরের রাস্তা এখন ফাকা। গাড়ির স্পিড একশ ত্রিশ কিলোমিটার। ড্রাইভার সিবি হঠাৎ প্রশ্ন করলো, তোমার টিকেট কোন এয়ারলাইনে?

অনেকটা সংকট নিয়েই বললাম, বিজি।

মালয় ট্যাকসি ড্রাইভার সিবি সশব্দে হেসে উঠে বললো, শুধু শুধুই রাতের ঘুমটা নষ্ট করলে। আমি নিশ্চিত তোমার ফ্লাইট ডিলে হবে।

বাংলাদেশ বিমানের সার্ভিসের দৈন্যতা আর শেডিউল বিপর্যয় নিয়ে আরো হাসিঠাট্টা করলো সিবি। লজ্জায়, অপমানে যখন কথা বলতে পারছিলাম না তখন সিবি বললো সরি তোমাকে আঘাত দেয়ার জন্য বলিনি।

ততোক্ষণে এয়ারপোর্টে ঢুকে পড়েছি। সিবি লাগেজপত্র নিয়ে বেশ সহযোগিতা করলো।

ভেতরে এসে সে বললো, দাড়াও আমি তোমার ফ্লাইটের খোজটা নিয়ে আসি।

দুই মিনিট পর সিবি ফিরে এলো, মুখে হাসি নেই। সংকোচ নিয়ে বললো, চলো তোমাকে বাইরে কোনো হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেই।

এতো বোকা নই যে, সিবির নীরবতার কারণ বুঝতে পারবো না। বললাম, নতুন শেডিউল কয়টায়?

বললো, বেলা সাড়ে বারোটা। তোমার ফ্লাইট সাতটা পাচ মিনিটে বাংলাদেশেই থাকবে।

পরে কখনো সুযোগ হলে সেদিনের সেই সীমাহীন দুর্ভোগের কথা আবার লিখবো। তবে হ্যা ফ্লাইট শেষ পর্যন্ত বেলা একটায় ওড়ে। বেলা দুইটা ত্রিশ মিনিটে যখন জিয়ায় নামার পর বিমান

কর্তৃপক্ষের বিদায়ী ঘোষণার একপর্যায়ে বলা হলো *আশা করি বাংলাদেশ বিমানে আপনাদের ভ্রমণ আনন্দদায়ক হয়েছে। আবারও বিমানে ভ্রমণে আমন্ত্রণ রইলো।*

তখন আমার নতুন চিন্তা, লাগেজগুলো ঠিকঠাক পাওয়া গেলেই হয়।

ইস্কাটন, ঢাকা থেকে

sraboum21@yahoo.com

ও আমার দেশের মাটি

মনিকা আলবার্ট

বিমানের চাকরির সুবাদে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে বেড়ানো হয়ে যায়। এক কথায় আমরা যারা এয়ারহস্টেস তাদের উড়ন্ত বিমানও বলা যায়।

ডিউটিকালীন যখনই দেশি কোনো ভাইবোনের সেবা করতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে করি। যদিও এটা আমার কর্তব্য।

মনে হয় যেন নিজ দেশের সেবা করছি। যখনই নিজ দেশের আকাশসীমায় প্রবেশ করি মনে হয় নিজ বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকলাম, এমন অনুভূতি সত্যিই চমকপ্রদ। কোথায় যেন পড়েছিলাম, দেশের প্রতি টান বুঝতে হলে একবারের জন্য হলেও বিদেশ যেতে হবে অথবা দেশের বাইরে ভ্রমণ করতে হবে। কথাটি একশ ভাগ সত্য।

সবাইকে উড়ন্ত বিমান থেকে শুভেচ্ছা রইলো।

monika1277@hotmail.com